Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পাপিয়া আক্তার

রোলঃ 23100120907

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পাপিয়া আক্তার

রোলঃ 23100120907

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পাপিয়া আক্তার, আইডিঃ 23100120907 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাপিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

পাপিয়া আক্তার

আইডিঃ 23100120907

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১:ভূমিকা 7

অধ্যায়-২:ইসলামী আকীদার উৎস 10

বিশ্বাস বনাম জ্ঞান 10

ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী 11

ওহীর প্রকারভেদ : কুরআন ও হাদীস 14

কুরআন মাজিদ 14

কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) 15

অধ্যায়-৩:ইসলামী আকীদার গুরুত্ব 17

বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন 18

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 19

বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 20

অধ্যায়-৪.ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুসঙ্গ 21

ঈমান স্থির মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম 21

ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম 22

ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি 24

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য 25

ঈমানের জন্য ইসলামের অপরিহার্যতা 26

শুধুমাত্র গুনাহের কারণে ইমান নষ্ট হয় না 27

মৌখিক উচ্চারণসংশ্লিষ্ট ইমানের শাখা 32

অধ্যায়-৫:অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি 36

বিভ্রান্তির উৎস 36

ওহীকে অগ্রাহ্য করা 37

লেকচার, সামাজিক প্রথা বা ব্যক্তিগত পছন্দ 39

মুফাসসির বা আলেমগণের মতামত:..40
কুফর...41
কুফরের পারলৌকিক বিধান...42
কুফরের ইহলৌকিক বিধান..43
উম্মাহর মতানৈক্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল..44
মুক্তিপ্রাপ্ত দল শুধু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত 45
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি 46
সুন্নাতুস সাহাবা 48
কর্ম বর্জনের সুন্নাত..49
ভ্রান্ত দলসমূহ..50
অধ্যায়-৬:ঈমানী আকাইদ ও আহকামের স্পষ্ট ঘোষণা 56
তাওহীদই ঈমানের সবচেয়ে বড় রুকন...59
তাওহীদের বিপরীত শিরক..63
শিরকের প্রকারভেদ..64
শিরকের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করেন না...69
অধ্যায়- ৭: বিদ'আত 75
কুরআন কারীমে বিদ'আত 77
হাদীসে নববীতে বিদ'আত 78
বিভিন্ন ধরনের বিদ'আতের উদাহরণ 81
বিদ’আতের ক্ষতিকর দিকসমূহ..83
বিদ’আত থেকে বেঁচে থাকার উপায়...86
অধ্যায়-৮:ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা 90
আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকিদা 92
ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা 93

আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা 94

নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা 95

বিশুদ্ধ ঈমান ও সহীহ আকিদা পরীক্ষা.. 96

অধ্যায়-৯:শেষকথা 99

অধ্যায়-১:ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো ঈমান। আর এই ঈমানের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে আকিদার উপর। আকিদা শব্দটি আরবি "عقيدة" থেকে এসেছে, যার অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। একজন মুসলমানের জীবনে সঠিক আকিদা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মদ: ১৯)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামের প্রথম ভিত্তিই হলো বিশুদ্ধ আকিদা। তাই একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঈমান একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা। আকিদা বলতে আমরা বুঝি–আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, কিয়ামত এবং তাকদীরের উপর সঠিক ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। যদি আকিদা বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে মানুষের আমল যত ভালোই হোক না কেন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, শিরক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ করে তোলে। একজন মুসলমান যখন সঠিক আকিদা ধারণ করে, তখন তার ঈমান মজবুত হয় এবং তার আমলেও এর সুন্দর প্রভাব পড়ে।আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ:"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"
– (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

এই আয়াত দিয়ে বোঝানো হয়েছে–মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো বিশুদ্ধ আকিদা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আন্তরিকভাবে (অন্তর থেকে) বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

- (সহিহ বুখারি) - হাদিস নং : ২৭

অর্থাৎ শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানের মূল ভিত্তি।

এক হাদিসে আবু হুরায়রা (রা) বলেন:

:كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ)جِبْرِيلُ (فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ .قَالَ :مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ :الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ .الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"একদিন নবী (ﷺ) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একজন ব্যক্তি (জিবরাঈল আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তর দিলেন: 'ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সাক্ষাৎ, তাঁর রাসূলগণ এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থান ও তাকদীরের সবকিছুতে।' তিনি প্রশ্ন করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: 'ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক বানাবে না, সালাত কায়েম করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে এবং রমাদানের সিয়াম পালন করবে।' " (বুখারী - আস সহীহ১/২৭,৪/১৭৩৩)

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমান ও ইসলামের উত্তরের পরিচিতি প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবি 'সালাম' (سلم) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পণ ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আদর্শিকভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিকভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন:

وَالإِيمَانُ هُوَ الإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ، وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ المُؤْمَنِ بِهِ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ اليَقِينِ وَالتَّصْدِيقِ، وَالمُؤْمِنُونَ مُتَسَاوُونَ فِي الإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاضِلُونَ بِالأَعْمَالِ، وَالإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالانْقِيَادُ لأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ، وَلَكِنْ لا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلا إِسْلَامٍ وَلا إِسْلَامٌ بِلا إِيمَانٍ، وَهُمَا كَالظَّاهِرِ مَعَ البَاطِنِ، وَالدِّينُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا.

"ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না কমে না; তবে ইয়াকীন ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার দিক থেকে বাড়ে-কমে। মুমিনগণ ঈমান ও তাওহীদের দিক থেকে সমান, কিন্তু আমলের দিক থেকে তারা ভিন্ন ভিন্ন। ইসলাম হলো আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। ভাষাগতভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু বাস্তবে ঈমান ছাড়া ইসলাম নেই এবং ইসলাম ছাড়া ঈমান নেই। এরা বাহ্যিক ও অন্তরের মতো। আর দ্বীন হলো ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তের সমষ্টিগত নাম।" (মুসলিম- আস সহীহ ১/৩৯,৪০,৪৭)

আকীদার ৬টি মূল ভিত্তি হলো ঈমানের পূর্ণ কাঠামো।

সুতরাং, বিশুদ্ধ আকিদা শুধু মুখের কথা নয়; বরং এটি মানুষের অন্তর, চরিত্র ও আমলে প্রতিফলিত হয়।

তাই একজন মুসলমানের ইমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইমানের মূল ভিত্তি, যার উপর একজন মুমিনের পুরো জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের জীবনে অনেক ভালো প্রভাব ফেলে–ইমান মজবুত হয়,আমল কবুল হয়,আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়,শিরক ও কুসংস্কার থেকে বাঁচা।

অধ্যায়-২:ইসলামী আকীদার উৎস

বিশ্বাস বনাম জ্ঞান

বিশ্বাস হলো কোনো বিষয়কে আন্তরিকভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া। সবকিছু চোখে দেখা বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও মানুষ অনেক বিষয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করে। যেমন একজন মুসলমান আল্লাহ, ফেরেশতা, কিয়ামত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আবার দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ পরিবার, বন্ধু বা সমাজের অনেক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বিশ্বাস মানুষের মনে আশা, সাহস ও মানসিক স্থিরতা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে জ্ঞান হলো শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সত্যকে জানার প্রক্রিয়া। জ্ঞান মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে সাহায্য করে এবং বাস্তবতার সাথে পরিচিত করে। একজন ডাক্তার চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন, একজন শিক্ষক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করেন, আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে নতুন সত্য উদ্ঘাটন করেন।

বিশ্বাস ও জ্ঞানের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো– বিশ্বাস অনেক সময় আস্থা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের উপর। তবে শুধু বিশ্বাস থাকলে মানুষ অন্ধ অনুসরণে পড়ে যেতে পারে, আর শুধু জ্ঞান থাকলে মানুষ আত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাই জীবনে উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্বাস বা আস্থার ভিত্তি হলো জ্ঞান। কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তা জানতে হয়। ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে দৃঢ়তার সাথে মানবীয় সম্পর্কিত মূল চাবিকাঠি হিসেবে ইমান তথা জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিশুদ্ধ ইমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরির গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈমান, বিশ্বাস, ধর্মীয় বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী?
আমরা জানি যে, ঈমান বা ধর্মাচরণের কেন্দ্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ। সকল যুগের মানব সমাজের ইতিহাস ও সভ্যতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল যুগে সকল দেশে সকল জাতি ও সমাজের প্রায় সকল মানুষই এ বিষয়ে বিশ্বাসী বা কমপক্ষে একথা মনে করে যে, এই বিশাল বিশ্বজগৎ কোনো স্রষ্টা অস্তিত্ব ছাড়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান বিশ্বের শতকোটি মানুষের মধ্যেও অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। এর মূলত দুটো কারণ রয়েছে:

প্রথমত: স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অনুভূতি। আত্মপ্রেম, পিতামাতা বা সন্তানের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদির মত স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে। মহান স্রষ্টা এই বিশ্বাসের অনুভূতি দিয়েই প্রতিটি মানব আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বাস বিকৃত হতে পারে, একে অবদমিত করা যায়, তবে একে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তাই যারা নিজেদেরকে স্রষ্টায় বিশ্বাসী নন বলে মনে করেন তাঁরাও মূলত মনের গভীরতম স্থান থেকে বিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারেন নি, যদিও তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন অবিশ্বাস করার।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও জানার নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে। তাই সৃষ্টির রহস্য ও সম্প্রতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, স্রষ্টার মহত্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ততই গভীর হচেছ। সৃষ্টির রহস্য, জটিলতা, মানবদেহ, জীবজগত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি বিশাল সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব নিয়ে যারাই গবেষণা বা চিন্তাভাবনা করেছেন বা করছেন, তারাই স্রষ্টার মহত্বের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হচ্ছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সকল দেশের সকল মানুষ যখন স্রষ্টার বিশ্বাসে একমত, তাহলে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত মতবিরোধ কেন?

এর কারণ, স্রেষ্টার অস্তিত্বে মূলত মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হয়েছে স্রষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব, তাঁকে ডাকার বা তাঁর উপাসনা করার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে। প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্মগত অনুভূতি দিয়ে এবং সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তবে কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর প্রতি মনের আকৃতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাহায্য, করুণা বা সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে যখনই মানুষ নিজের ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ করে, তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

এ জন্য মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না সে সকল বিষয় তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।

কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী রসুলদের উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত-আরাধনা করতে হবে, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কিরূপ হবে, মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন। এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী । এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা

পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না।"সূরা আরাফ : আয়াত ৭

ওহীর বিপরীতে ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষদের যুক্তি ও প্রমাণ ছিল সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ। এই প্রবণতাকে বিভিন্ন মানব সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে কুরআন কারীমে চিত্রিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সঠিক বিশ্বাস বা ইসলাম প্রচার করেন, তখন সেই জাতির অবিশ্বাসীরা নবী-রাসুলদের আহবান এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের প্রচারিত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী, তারা যুগ যুগ ধরে যা জেনে আসছেন মেনে আসছেন তার বিরোধী। নূহ (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন তার উম্মতকে ইসলামের পথে আহবান করলেন তখন তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে।

وما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ

"আমাদের পূর্ব পুরুষদের কালে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনি নি।"সুরা (২৩) মুমিনুন: ২৪ আয়াত।

মূসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহবান করেন তখন তারাও একই যুক্তিতে তার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে বলে।

সকল যুগে অবিশ্বাসীরা এ যুক্তিতেই ওহী প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা এই একই যুক্তিতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার তাদের এই যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ওহীর প্রকারভেদ : কুরআন ও হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দু' প্রকারে ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু' ভাবে তা সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব ও হিকমাহ বা সুন্নাহ।রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রেরিত ওহীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে তাঁর সাহাবা-সাহাবীগণের মতামতসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

কুরআন মাজিদ

কুরআন কারীম মানব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর সর্বশেষ বাণী। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন থেকে আল্লাহ তা' আলা তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন নাযিল করা শুরু করেন। পরবর্তী ২৩ বছর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বছরের এ পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়। আল্লাহর নিকট থেকে প্রথম ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের তা মুখস্থ করে নিতে উৎসাহ দিতেন এবং লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দিতেন।

এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকালে পুরোপুরি মুখস্থ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অসংখ্য সাহাবা তা মুখস্থ করেন। তাঁর সময়ে থেকেই তা সাহাবীগণের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে তা শিক্ষা দেওয়া হয়।

নবীজি ﷺ কুরআনের প্রতিটি আয়াত নির্দিষ্টভাবে লিখিয়ে নিতেন এবং কোথায় কোন আয়াত থাকবে তা নির্দেশ দিতেন।

এছাড়া, সাহাবীগণ নিয়মিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং একে অপরের সাথে মিলিয়ে নিতেন। কেউ কেউ এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। এভাবে কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমআর খুতবা এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

পরবর্তী সময়ে খলিফা আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে লিখিত বিভিন্ন কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে কুরআনকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ সংকলন করেন। পরবর্তীকালে খলিফা উসমান (রা.) তাঁর শাসনামলে মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কুরআনের মানসম্মত কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এভাবে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ পাঠের জন্য কুরআনকে সর্বত্র প্রচলিত করা হয়। ফলে কুরআন আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনি অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন।

এ কুরআনই মানব জাতির পথপ্রদর্শক এবং সকল কল্যাণের উৎস। এতে রয়েছে সকল উপদেশ, শিক্ষা ও সকল আত্মিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলাই হচ্ছে সঠিক পথ।

কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যে ওহী পাঠিয়েছেন তা ছিল দুই প্রকারের। প্রথম প্রকার ওহী কুরআন, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠিত শব্দ ও অর্থসহকারে মুখস্থ করেছেন, সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন এবং লিখিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকার ওহীর মূল অর্থ ‘জ্ঞান’ বা ‘প্রজ্ঞা’ – আল্লাহ তা তাঁর উপর নাযিল করেছেন। তিনি নিজের ভাষায় তা সাহাবীদেরকে বলেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, মুখস্থ করিয়েছেন এবং কখনো লিখিয়েছেন। কুরআন কারীমে প্রথম প্রকার ওহীকে ‘কিতাব’ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে ‘হিকমাহ’ বা ‘সুন্নাহ’ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(সূরা আলে - ইমরান আয়াত ১৬৪).

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহী 'হাদীস' বা 'সুন্নাহ' নামে পৃথকভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা বা নতুন বিষয়। ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকেই হাদীস বলা হয়।মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে প্রচার করা হয়েছে বা দাবি করা হয়েছে" তাই "হাদীস" বলে পরিচিত। এছাড়া তাবিয়ীগণ ও তাবে-তাবিয়ীগণের কথা, কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ' হাদীস" বলা হয়। সাহাবীগণের কথা, কাজ বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাওকূফ হাদীস" বলা হয়।এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঈমান, আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক মতভেদের মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণে ভিন্নতা। কুসংস্কার, শিরক, বিদআত, দলাদলি, বিভেদ ইত্যাদি সব কিছুর মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে ভুল, অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা।

আমরা দেখি যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলো 'গায়েব' বা অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত। আর অদৃশ্য জগতের কোনো কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা বা কল্পনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়; এর একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী। সুতরাং কোনো মানুষ ওহীর অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান বা সূত্র দ্বারা আকীদার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর ফলে বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

অধ্যায়-৩:ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে আল্লাহর সঠিক পরিচয় দেয়। একজন মুমিন যখন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ এক, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য– তখন তার অন্তরে তাওহিদের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়। এই বিশ্বাস মানুষকে শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত পথ থেকে রক্ষা করে। কারণ আকিদা ঠিক থাকলে মানুষ বুঝতে পারে যে সাহায্য, উপকার ও ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ।

ইসলামি আকিদা মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে। বাহ্যিক আমল যত বেশি হোক, আকিদা বিশুদ্ধ না হলে সেই আমলের মূল্য আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্য নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষের আকিদা সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। তারা মানুষকে তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না; এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

– সূরা আন-নিসা: ৪৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আকিদার শুদ্ধতা মানুষের মুক্তি ও সফলতার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের ইবাদতে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তাকে সবসময় দেখছেন এবং তার প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে, তখন সে ইবাদত ও নেক আমলে আরও যত্নবান হয়। নামাজ, রোজা, দান-সদকা ও অন্যান্য ইবাদতের প্রাণশক্তি আসে সঠিক আকিদা থেকে।

ইসলামি আকিদা মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়, জুলুম ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস মানুষের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। ফলে সে সত্যবাদী, আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করে।

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে মানসিক শান্তি ও দৃঢ়তা দেয়। পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার সময় একজন মুমিন তার আকিদার শক্তিতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। কারণ সে বিশ্বাস করে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং প্রতিটি কষ্টের

বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেবেন।ইসলামের সকল বিষয় ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনি আকীদার ক্ষেত্রে ইসলামী ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইসলামী আকীদার পাঠ ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্ন বিষয়গুলো জানতে পারি:

(১) বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ

(২) ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সংশ্লিষ্ট কারণ ও স্বরূপ

(৩) বিদআতী আকীদাসমূহ, সংশ্লিষ্ট কারণ ও স্বরূপ

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলো বিশুদ্ধভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। তার দুনিয়াবী ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাস মানুষের সকল সফলতা ও সার্থকতার ভিত্তি। বিশ্বাস মানুষের পরিচালনার শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অপরিমেয় শান্তি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষকে অন্ধকারে, অশান্তি ও হতাশায় নিক্ষেপ করে ফেলে।

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। আমরা যতই উত্তম কাজ করি না কেন, সর্বপ্রথম দরকার কিন্তু কর্ম বা উপাসনা হওয়ার পূর্ব শর্ত বিশুদ্ধ বিশ্বাস-সম্পন্ন ঈমান। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে।

এক স্থানে আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

"এবং যে ব্যক্তি পরকালীন জীবন কামনা করে, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।"

সূরা (১৭) বনী ইসরাঈল : ১৯ আয়াত

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী জীবন লাভের জন্য দরকার হলো সঠিক ঈমান।

আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং (আখিরাতে) তাদের কর্মের উত্তম প্রতিদান প্রদান করব।" সূরা নাহল(১৬) :আয়াত ৯৭

দুনিয়াতে সার্থক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রকৃত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অন্তরে আল্লাহর ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল, ফলে আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দিলাম।" সূরা আরাফ(৭): আয়াত ৯৬

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

কাফের, ইহুদী, খ্রিষ্টান, আবালবৃদ্ধবনিতা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলে নিজেদেরকে সঠিক মুসলিম বলেই দাবি করে। নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনকেই বিকৃত ও ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে এবং তাদের নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রচার করে। কিন্তু ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়াদি বা শিরকের ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে।

এজন্য মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“নিশ্চয় তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” সূরা যুমার (৩৯):আয়াত ৬৫

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” সূরা মায়িদা(৫) : আয়াত ৫

বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই মুসলিমের নাজাতের একমাত্র পথ। সকল বিষয়ের ন্যায় ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের পথ। তিনি যে কাজ করেননি তা করা বা দীনদারী মনে করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ বলে গণ্য করা এবং পাপ। অনুরূপভাবে বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেননি তা বলা বা এমন কোনো বিষয়কে ইসলামী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করাও তাঁর সুন্নাতকে অবহেলা করা ও অপূর্ণ মনে করা। এরূপ করা কঠিন পাপ।

কর্মের ক্ষেত্রে কেউ কুফরী করলেও বা কুফরের ক্ষেত্রে পতিত না হলেও বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নাত-বিরোধিতার কারণে ঐ ব্যক্তি পাপী হন। এরূপ ব্যক্তি বিশেষভাবে বিভ্রান্তির কারণে জাহান্নামী হতে পারে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সকল ফিকহের জাহান্নামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির; বরং আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাতের বিরোধিতা করার ফলে তারা আকীদাগত পাপে নিমজ্জিত হয় এবং এজন্য তারা জাহান্নামী হবে।

আর সাধারণভাবে আকীদাগত বিভ্রান্তি মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করেছেন তা জানা মুসলিমের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁরা যা বলেছেন তা বলা, তাঁরা যা বলেননি তা না বলা এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করা হলো ইসলামী আকীদার গঠন ও সুরক্ষার অন্যতম উপায়।

অধ্যায়-৪.ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুসঙ্গ

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অন্ধকার। ঈমান জীবন, কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফর ভ্রষ্টতার রাস্তা।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, কুফরকে আলিঙ্গন করতে পারে না, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমান তার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। ঈমান শুধু কথার নাম নয়, ইসলামদার তার সকল অপরিহার্য অনুসঙ্গ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর এ-কারণে মুমিনকে হতে হবে সৎ, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরের সাথে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও মুনাফিকের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না। ঈমান-ইসলামের সঠিক অর্থ কি, তা জানাও জানা হওয়া ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ থাকা অসম্ভব। কাকে বলে ঈমান আর তার অপরিহার্য অনুসঙ্গ কী– এ সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হল।

ঈমান স্থির মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম

অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ঈমানে নেই। ঈমান এ সত্যকে সঠিক আকীদা হিসেবে গ্রহণ করা এবং সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে এসেছে। এটাই ‘আল কুরআনুল কারীম’ এবং সুন্নাহর মাধ্যমে মানবজাতির রূপে এখনও সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ঈমান হলো অন্তরের এমন দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর পক্ষ থেকে আগত সকল সত্য বিষয়কে নির্ভুল ও সত্য বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীর–এসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোকে অন্তর দিয়ে সত্য বলে স্বীকার করাই ঈমান। এই স্বীকৃতি শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা হৃদয়ের গভীরে স্থির

বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মানুষের কথা, কাজ ও চরিত্রে তার প্রভাব প্রকাশ পায়।

ঈমানের মূল ভিত্তি হলো “তাসদীক” বা সত্যায়ন। একজন মুমিন আল্লাহর নির্দেশ ও ওহীকে সন্দেহ ছাড়াই সত্য বলে গ্রহণ করে। পৃথিবীর সব বিষয় মানুষ নিজের চোখে দেখে বা বুদ্ধি দিয়ে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সংবাদ দিয়েছেন, মুমিন তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়। তাই ঈমান কেবল জ্ঞান অর্জনের নাম নয়; বরং সেই জ্ঞানকে দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে হৃদয়ে ধারণ করার নাম।

যখন মানুষের অন্তরে এই স্থির বিশ্বাস জন্ম নেয়, তখন সে আল্লাহর আনুগত্যে আগ্রহী হয়, গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করতে চায়। এ কারণেই ঈমানকে শুধু মুখের দাবি নয়, বরং হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের প্রতিফলন বলা হয়।

ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম

ঈমান হলো মানুষের অন্তরের এমন দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস, যা সন্দেহ, দ্বিধা ও অস্বীকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটি শুধু মুখের উচ্চারণ নয়; বরং অন্তরের গভীর বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং কাজের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রকাশ। একজন মুমিনের জীবনে ঈমানই সবচেয়ে বড় সম্পদ। কারণ ঈমান মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখায় এবং তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

অবিচল বিশ্বাস বলতে বোঝায় এমন দৃঢ়তা, যা সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, ভয় বা প্রলোভনের মধ্যেও টলে যায় না। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এমন বিশ্বাস রাখে যে পৃথিবীর কোনো পরিস্থিতিই তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। সে জানে, আল্লাহ যা করেন তা বান্দার কল্যাণের জন্যই করেন এবং আল্লাহর ফয়সালার মধ্যেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

ইসলামে ঈমানের ভিত্তি হলো তাওহিদ– অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এর সাথে রয়েছে ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত ও তাকদিরের উপর বিশ্বাস। একজন মুসলমান যখন এসব বিষয়ের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে, তখন

তার অন্তরে ঈমানের শক্ত ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই ঈমানই তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।”

– সূরা আল-আনফাল: ২

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ঈমান শুধু একটি ধারণা নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তার জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়।

অবিচল ঈমান মানুষের মনে ধৈর্য ও সাহস সৃষ্টি করে। একজন মুমিন বিপদের সময় হতাশ হয় না, কারণ সে বিশ্বাস করে আল্লাহ তার সাথে আছেন। দুঃখ-কষ্টের সময় সে আল্লাহর সাহায্যের আশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এভাবেই ঈমান মানুষের জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর করে তোলে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তি লাভ করে, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।”

– সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে প্রকৃত ঈমান অন্তরের প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির নাম। যখন মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন তার অন্তরে শান্তি সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা অর্জন করে।ঈমান অবিচল রাখতে হলে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ, দোয়া, নেক আমল এবং সৎ মানুষের সঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি শিরক, বিদআত, গুনাহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ গুনাহ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

অতএব, ঈমান কেবল মুখের দাবি নয়; বরং এটি অবিচল বিশ্বাসের নাম। যে বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় রাখে, সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং দুনিয়া ও

আখিরাতে সফলতার দিকে নিয়ে যায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের ঈমানকে বিশুদ্ধ, দৃঢ় ও অটুট রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা।
ঈমান তো অবিচল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার ভিত্তিতে ঈমান হতে পারে না। সন্দেহ যদি থাকে তবে তা আকীদা কিভাবে হয়? বিশ্বাস যদি দৃঢ় না হয় তবে তা ঈমান কিভাবে হয়?

ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের অর্থ হলো, যে ঈমান সকল ঈমানদারের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান, যার ওপর ঈমানি ভ্রাতৃত্ব নির্ভরশীল এবং যে ঈমানের ভিত্তিতে মুসলমান ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।
আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই। [সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১০]
হ্যাঁ, আনুগত্য ও সৎকাজের প্রেক্ষিতে ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আনুগত্য যত বেশি হবে, ঈমান তত বেশি পরিপূর্ণ হবে। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের ঈমান নবিগণের ঈমানের মতো হবে না কখনো। কারণ, নবিগণের ঈমান আনুগত্য ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে এত উচ্চ পর্যায়ের যে, সাধারণ মুসলমানের ঈমান সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না।
যদি খোদ ঈমানের মূল্যায়নে উভয়েই অভিন্ন; কিন্তু আনুগত্যের মাধ্যমে নবিগণের ঈমান এত শক্তিশালী হয়েছে যে, এই ঈমানের প্রকৃতিই অন্যরকম। অন্যদের ঈমান তাদের ঈমানের কাছাকাছিও নয়; এমনকি কোনো তুলনার অবকাশও নেই। সাধারণ মানুষ ও নবিগণের মানবতা গুণগতভাবে একই এবং অভিন্ন; কিন্তু নবিগণের পরিপূর্ণ মানবতা এত উন্নত যে, তাদের মানবতার পর্যায় ও প্রকৃতি সাধারণ মানুষের মানবতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এমনকি তা মানুষ হওয়ার অভিন্ন ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কেবল নামমাত্র ও শাব্দিক মিল রয়েছে। প্রকৃত মিল এতে নেই; বরং প্রকৃত মানুষ ছিলেন নবিগণ আ.। আর বাকি মানুষকে তো বর্ণনাময় বলা যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি দুটো ভিন্ন আয়না দেখে বলে, এই দুটো আয়না প্রকৃতিতে এক এবং আয়না দুটোর মধ্যে কম-বেশি নেই; কিন্তু আলোলোকচ্ছটা ও স্বচ্ছতার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাহলে ওই ব্যক্তির এ মূল্যায়ন সঠিক ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দলিল বলে বিবেচিত হবে। তার অর্থ এই যে, প্রকৃতি অভিন্ন ও মৌলিক এক, এর মধ্যে কোনো কম-বেশি হতে পারে না; পার্থক্য হলে গুণের। যে ব্যক্তি দুটি আয়নার মধ্যে পার্থক্য করে, সে আয়নার প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করে না। অনুরূপভাবে ঈমানকে বুঝতে হবে যে, ঈমানের হাকিকতের মধ্যে কম-বেশি হয় না; বরং তার গুণের মধ্যে হয়ে থাকে। কারণ ঈমান নুরানি ও উজ্জ্বল হয় এবং কারও ঈমান অন্ধকার, স্থবির ও রঙহীনতায় হয়ে থাকে।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

'ঈমান' শব্দটি 'আমনুন' ও 'আমানাতুন' থেকে উৎপত্তি। অভিধানে ঈমানের অর্থ, সরাসরি না দেখে কোনো সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং সংবাদদাতার বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করে সংবাদের সত্যতা মেনে নেওয়া। সূর্য ওঠার পর সংবাদ প্রদানকারীকে 'সাদ্দাকনা' (সত্যায়ন করলাম) ও 'সাল্লামনা' (মেনে নিলাম) বলা হয়; কিন্তু 'আমান্না' (ঈমান আনলাম) বলা হয় না। কারণ, সূর্যের ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাসের বিষয়; কেননা সূর্য দৃশ্যমান বিষয় নয়। আভিধানিক অর্থানুসারে ঈমানের অর্থ অদৃশ্য ও অনুভূতি-বহির্ভূত জিনিসের সত্যতা। সাধারণত যেসব জিনিস চোখে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে 'তাসদীক' শব্দ প্রয়োগ হয়; কিন্তু তাকে ঈমান বলা যাবে না।

শরীয়তের পরিভাষায় নবিগণের সংবাদের উপর নির্ভর করে আল্লাহর বিধান ও অদৃশ্য সংবাদসমূহ অন্তরে দ্বারা সত্যায়ন করার নাম ঈমান। যেমন ফেরেশতাদের না দেখে কেবল নবির সংবাদের উপর ভিত্তি করে তাদের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার নাম ঈমান; কিন্তু মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের নিজ চোখে দেখে মেনে নেওয়ার নাম ঈমান নয়। কেননা, এটা নিজ চোখে দেখার ভিত্তিতে হয়ে থাকবে। এর মাঝে নবী ﷺ-এর সংবাদের উপর নির্ভরশীলতা নেই।

‘ইসলাম’ -এর আভিধানিক অর্থ আনুগত্য ও অনুগত করা। অন্যভাবে বলা যায়, নিজেকে কারও কাছে সমর্পণ করে দেওয়া। (সেথায়)
শরীয়তের পরিভাষায়–সত্য নবির নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের নাম ইসলাম। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের নাম ইসলাম নয়। বাদশাহ এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে এমন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য, যা মন্ত্রণালয়ের আদেশের অনুসরণে পালন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য-পালনীয় মনে করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর আনুগত্য নবিগণ আল্লাহর পরিচয় এবং প্রেরিত নির্দেশনার সর্বোচ্চ ভজন না করে খেয়ালখুশি অনুযায়ী কাজ করা যেতে পারে না। সুতরাং পরমতসহিষ্ণু তত্ত্বের পরিভাষায় নীতিমালা অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য করাকেই ইসলাম বলা হবে। এর বিপরীত অর্থ, আল্লাহর আনুগত্য শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে না করলে তা হবে কুফরি।

ঈমানের জন্য ইসলামের অপরিহার্যতা

ঈমান ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের নাম; কিন্তু ঈমানের জন্য ইসলাম অর্থাৎ আনুগত্যও আবশ্যক। একজন ব্যক্তি যদি কেবল সেই ইসলামের (আনুগত্য ও অনুসরণ) গ্রহণ করে, যার সাথে আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস সম্পৃক্ত থাকবে না, তাহলে আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ছাড়া বাহ্যিক আনুগত্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং এ ধরনের ঈমানদারকে মুনাফিক বা ভণ্ড বলা হবে। শরীয়তে মুসলিম ও মুসলমান শব্দ দুটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে।
ঈমান মানুষের অন্তরের বিশ্বাস, আর ইসলাম সেই বিশ্বাসের বাস্তব রূপ। একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহকে একমাত্র রব ও উপাস্য হিসেবে মেনে নেয় এবং রাসূল ﷺ-এর সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তার অন্তরে ঈমান জন্ম নেয়। কিন্তু সেই ঈমানকে বাস্তব জীবনে প্রকাশ করার জন্য ইসলামের বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। কারণ ইসলাম ছাড়া ঈমান কেবল মুখের দাবি হয়ে থাকে, বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।
ইসলাম মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে। একজন মানুষ নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে, সত্য কথা বলে, হারাম থেকে বেঁচে থাকে, মানুষের হক

আদায় করে এবং নৈতিক জীবন যাপন করে—এসবই তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও যদি মানুষের কাজ-কর্মে ইসলামের কোনো ছাপ না থাকে, তাহলে সেই ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ঈমানকে জীবন্ত ও কার্যকর রাখার জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

ইসলাম মানুষের চরিত্র, আচরণ ও চিন্তাধারাকে শুদ্ধ করে। একজন মুমিন যখন ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তখন তার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার মানসিকতা তৈরি হয়। ফলে তার ঈমান আরও শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধান থেকে দূরে সরে গেলে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং ঈমান দুর্বল হতে থাকে।

ঈমান ও ইসলাম একে অপরের পরিপূরক। ঈমান হলো গাছের শিকড়ের মতো, আর ইসলাম হলো সেই গাছের ফল ও শাখা-প্রশাখা। শিকড় থাকলে যেমন গাছ বেড়ে ওঠে, তেমনি ইসলামী আমল থাকলে ঈমান শক্তিশালী হয়। আবার শিকড় দুর্বল হলে গাছ টিকে থাকতে পারে না; একইভাবে ঈমান দুর্বল হলে ইসলামী আমলেও দুর্বলতা দেখা দেয়।

একজন প্রকৃত মুমিন শুধু বিশ্বাসের দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সে নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলে। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, পারিবারিক জীবন ও সমাজজীবনে ইসলামের প্রভাব প্রকাশ পায়। কারণ ইসলাম মানুষের পুরো জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার জন্য এসেছে।

তাই বলা যায়, ইসলামের আনুগত্য ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলামই ঈমানকে সংরক্ষণ করে, শক্তিশালী করে এবং মানুষের জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়।

শুধুমাত্র গুনাহের কারণে ইমান নষ্ট হয় না

(গুনাহকে হারাম জেনে) কোনো মুমিন কবিরা গুনাহ করলেও ইমানচ্যুত হয় না। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল বলেন,

ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ :الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلا تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ،

وَالإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ

তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত:

(১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে তার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা, কোনো গুনাহের কারণে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত না করা এবং কোনো আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না করা।

(২) আমাকে (রাসুল করে) প্রেরণের সময় থেকে জিহাদ চালু রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। অবশেষে উম্মতের জিহাদকারী সর্বশেষ দল দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার অথবা কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ এটাকে রহিত করতে পারে না।

(৩) তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা।"

মানুষ স্বভাবগতভাবেই দুর্বল। জীবনের বিভিন্ন সময়ে সে ভুল করতে পারে, গুনাহে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র গুনাহ করার কারণে একজন মুসলমান ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। কারণ ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি এবং দ্বীনের সত্যতাকে মেনে নেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক আকিদা অস্বীকার না করে বা কুফরিতে লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহগার হতে পারে, কিন্তু কাফির হয়ে যায় না।

গুনাহ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে, অন্তরকে কালো করে দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন ব্যক্তি যখন বারবার পাপ কাজে জড়ায়, তখন তার অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে তার আত্মিক শক্তি দুর্বল হতে থাকে। তবুও তার অন্তরে যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, দ্বীনের প্রতি সম্মান এবং তাওবার অনুভূতি থাকে, তাহলে তার ঈমান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় না।

একজন প্রকৃত মুমিন গুনাহ করলে অন্তরে অনুশোচনা অনুভব করে। সে নিজের ভুল উপলব্ধি করে এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে চায়। এই অনুশোচনাই ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ যার অন্তরে ঈমান নেই, সে গুনাহকে গুনাহ মনে করে না; বরং তা নিয়ে গর্ববোধ করে বা আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ মনে করে।
ইসলামে গুনাহ ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সব গুনাহ কুফর নয়। কিছু কাজ বড় গুনাহ হলেও তা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে যদি কেউ গুনাহকে হালাল মনে করে, আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে বা দ্বীনের কোনো নিশ্চিত বিষয়কে অস্বীকার করে, তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই শুধু গুনাহ নয়, বরং আকিদাগত বিচ্যুতিই ঈমান ধ্বংসের মূল কারণ।
এমন জীবন গঠন করা যাতে মৃত্যুর সময় সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করতে পারে।

ঈমানের শাখা

হাদিসে আছে,
الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ইমানের ৭০-এর অধিক (অর্থাৎ, ৭৭টি) শাখা আছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। আর সবচেয়ে নিম্নতর হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া এবং লজ্জা ইমানের বিশেষ শাখা।

আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ইমানের শাখা

আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ইমানের শাখা ৩০টি:

১. আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট, এটা বিশ্বাস করা।

৩. ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪. রাসুলগণের ওপর নাজিলকৃত আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫. নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরে বিশ্বাস করা।

৭. কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৮. জান্নাতের ওয়াদা ও জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৯. জাহান্নামের সতর্কবার্তা ও আজাবের ওপর বিশ্বাস করা।

১০. আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখা।

১১. একমাত্র আল্লাহর জন্যই কারও সঙ্গে ভালোবাসা বা শত্রুতা রাখা।

১২. রাসুল-কে ভালোবাসা।

১৩. ইখলাস (একনিষ্ঠতা)।

১৪. তাওবা ও ইসতিগফার।

১৫. অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা।

১৬. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।

১৭. লজ্জা করা।

১৮. কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

১৯. অঙ্গীকার পূরণ করা।

২০. ধৈর্যধারণ করা। তাওয়াজু অর্থাৎ, বিনয়-নম্রতা পোষণ করা এবং নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট মনে করা। শুধু মুখে নিজেকে তুচ্ছ বললে হবে না; বরং অন্তরে তা পোষণ করতে হবে। এর মধ্যে বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করাও অন্তর্ভুক্ত।

২১. দয়া ও বাৎসল্য-অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও স্নেহপরায়ণ।

২১. দয়া ও বাৎসল্য-অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও স্নেহপরায়ণ হওয়া। এর মধ্যে ছোটদের স্নেহ করাও অন্তর্ভুক্ত।

২২. আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

২৩. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।

২৪. আত্মগরিমা পরিত্যাগ করা। এর মধ্যে আত্মপ্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত।

২৫. হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করা।

২৬. বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিহার করা।

২৭. রাগ পরিহার করা।

২৮. কুমতলব পরিহার করা। এর মধ্যে কুধারণা ও কুপরামর্শও অন্তর্ভুক্ত।

২৯. জুহদ-অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা পরিহার করা। দুনিয়া দুটি জিনিসের নাম: একটি হলো সম্পদ আর অপরটি প্রতিপত্তি।

মৌখিক উচ্চারণসংশ্লিষ্ট ইমানের শাখা

১. তাওহিদের কালিমা উচ্চারণ করা এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩. ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করা।

৪. ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

৫. দুআ করা।

৬. আল্লাহর জিকির করা। এর মধ্যে ইসতিগফারও অন্তর্ভুক্ত।

৭. অনর্থক ও অহেতুক কাজ না করা এবং এরূপ কথা না বলা।

এই সাতটি শাখা মৌখিক উচ্চারণসম্পর্কিত। এখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনীয় শাখাগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এগুলোর সংখ্যা ৪০। এই ৪০টির মধ্যে ১৬টি ব্যক্তির সত্তার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, ছয়টি তার পরিবার-পরিজন ও কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ১৮টি সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সংশ্লিষ্ট ইমানের শাখা

১. পবিত্রতা। এর মধ্যে শরীর, পোশাক, ও স্থানের পবিত্রতা এবং অজু, গোসল ও তায়াম্মুম সবকিছু অন্তর্ভুক্ত।

২. সালাত কায়েম করা। এর মধ্যে ফরজ, নফল ও কাজা-সব সালাত অন্তর্ভুক্ত।

৩. জাকাত আদায় করা। এর মধ্যে সাদাকাতুল ফিতর এবং মেহমানদারিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪. ফরজ, নফল ইত্যাদি সব রোজা রাখা।

৫. হজ ও উমরা করা।

৬. ইতিকাফ করা। লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৭. দীন হিফাজতের জন্য ফিতনার স্থান পরিত্যাগ করা। এর মধ্যে হিজরত করাও অন্তর্ভুক্ত।

৮. জায়িজ বিষয়ে মানত পূরণ করা।

৯. নিজের কসম বা প্রতিজ্ঞার প্রতি খেয়াল রাখা।

১০. কাফফারা আদায় করা।

১১. সালাতরতা অবস্থায় এবং সালাত ছাড়াও অন্য সময় শরীর সতর ঢেকে রাখা।

১২. কুরবানি করা।

১৩. মুসলমান মৃতের জানাজা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

১৪. ঋণ পরিশোধ করা।

১৫. লেনদেনে সততা বজায় রাখা।

১৬. সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া এবং পার্থিব ও ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সাক্ষ্য গোপন না করা।

উপরিউক্ত **১৬**টি শাখা মানুষের সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখন পরিবার-পরিজন ও কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কিত শাখা বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলোর সংখ্যা ছয়টি।

যথা:

১. বিয়ে করা, যাতে পবিত্রতা অর্জিত হয়।

২. পরিবার-পরিজনের অধিকার প্রদান করা।

৩. পিতা-মাতার প্রতি ইহসান এবং তাদের সেবা করা।

৪. সন্তানদের শরিয়ত মোতাবিক লালনপালন ও শিক্ষাদান করা।

৫. আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও ইহসান করা।

৬. মালিকের আদেশ পালন করা। (এ নির্দেশ দাস-দাসীর জন্য)

সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা হচ্ছে **১৮**টি। যথা:

১. শাসনকর্তা হলে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ করা।

২. মুসলমান জামাআতের অনুসরণ করা। অর্থাৎ, সাহাবিগণের যে তরিকা ছিল, সেই তরিকার ওপর চলা।

৩. মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা। তবে শর্ত হলো, তাদের নির্দেশ যেন শরিয়ত অনুযায়ী হয়।

৪. মানুষের কল্যাণ ও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা। হুকুমতের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নীতিও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন করাও একটি কল্যাণমূলক কাজ।

৫. ভালো এবং নেককাজে সহযোগিতা করা।

৬. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা-প্রদান করা।

অধ্যায়-৫:অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত ‘অবিশ্বাস’ । অবিশ্বাস সামগ্রিক বা ব্যাপক হতে পারে এবং আংশিকও হতে পারে। ঈমান বা বিশ্বাসের বিভিন্ন শাখা ও বিষয় রয়েছে। কোনো ব্যক্তির এ সকল শাখা বা বিশ্বাসের সকল বিষয় অস্বীকার করতে পারে। আবার অবিশ্বাস বা বিভ্রান্তির বিষয়টিও বিভিন্ন অধিকৃত হতে পারে। ফলে এমন অনেক ক্ষেত্র দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি আংশিক বিশ্বাস করেন এবং কিছু বিষয় বিশ্বাস করেন না অথবা কিছু বিষয় অস্বীকার করেন। সামগ্রিক বা আংশিক উভয় প্রকার অবিশ্বাসেরই বিভিন্ন কারণ ও প্রকার রয়েছে।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অবিশ্বাস, একত্ববাদ তাওহীদ, শিরক, মুনাফিকী, ইসলামের বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাস বা কুফর ও শিরকের জন্ম নিয়েছে। ঈমান থেকেই কুফরী জন্মেছে এবং একদল ফেরেশতা ইসলামের নামে কুফরী প্রচার করেছে। ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের অনুসারীরা বিভিন্ন কিতাব বা তথ্য এবং আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গুমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাসের কারণ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শিরকও এ বিষয়কে অনেক ব্যাখ্যা করেছে।

বিভ্রান্তির উৎস

বিভ্রান্তির উৎসের মধ্যে রয়েছে–

ওহী অস্বীকার করা

যুগে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ওহীর প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে দাবি করেন তারা ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। এরা নাস্তিকতা বা নাস্তিক দর্শনের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কথা বুঝাতে চান। এ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বে প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান অসাধারণ বৈজ্ঞানিক

শৃঙ্খলার মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও মহান স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের অন্তরের গভীরে বিশ্বাসের অনুভূতিকে তারা চাপা দিয়ে রাখে। বিবেকের দৃষ্টিতে বিশ্বাসের সত্যতা উপলব্ধি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেকে সত্যকে অস্বীকার করে। এজন্য তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন।

নাস্তিক বা চিন্তাবিদ নামধারী অনেক মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। তারা ধারণা করেন যে, স্রষ্টা এই জগত ও প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করে এগুলোকে নিজস্ব নিয়মে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা আরও মনে করেন যে, স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয়। তারা দাবি করেন যে, মানুষ তার বিবেক ও জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছু জানতে সক্ষম। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ মানুষের জ্ঞান ও বিবেক সীমিত।

ওহীকে অগ্রাহ্য করা

অনেক মানুষ ওহীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ না করার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু' ভাবে ওহীর কার্যকারিতা অস্বীকার করা হয়– (১) ওহীর ব্যাখ্যায় মানুষের ব্যক্তিগত মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া, অথবা (২) ওহীর নির্দেশনা একটি নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের জন্য প্রযোজ্য– এমন ধারণা করা। এ ধরনের চিন্তাধারা বিভ্রান্তির অন্যতম কারন।

ওহীকে অগ্রাহ্য করা মানে আল্লাহর নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটি শুধু একটি সাধারণ অবাধ্যতা নয়; বরং আল্লাহর জ্ঞানের উপর মানুষের নিজের প্রবৃত্তি, মতামত ও মনগড়া চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম। যখন মানুষ ওহীর পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা, সমাজের রীতি বা অন্য কোনো মতবাদকে চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে, তখন সে ধীরে ধীরে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

ওহী মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। এটি মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা ও কল্যাণ-অকল্যাণের সঠিক মানদণ্ড শেখায়। কিন্তু কেউ যদি ওহীকে উপেক্ষা করে, তাহলে তার জীবনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কারণ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা পরিবর্তনশীল, সীমাবদ্ধ এবং ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আজ যা মানুষ সঠিক মনে করে, কাল

সেটাকেই ভুল প্রমাণ করতে পারে। অথচ ওহী হলো চিরন্তন সত্য, যা কখনো পরিবর্তিত হয় না।

ওহীকে অগ্রাহ্য করার অন্যতম কারণ হলো অহংকার। অনেক মানুষ সত্য জানার পরও তা মেনে নিতে চায় না, কারণ তারা নিজেদের চিন্তাধারা ও প্রবৃত্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কেউ কেউ মনে করে মানুষের তৈরি মতবাদই যথেষ্ট, তাই আল্লাহর বিধানের প্রয়োজন নেই। আবার কেউ পার্থিব স্বার্থ, ক্ষমতা বা সামাজিক চাপের কারণে ওহীর নির্দেশনা অনুসরণ করতে চায় না। এভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর হিদায়াত থেকে দূরে সরে যায়।

ওহীকে অস্বীকার বা অবহেলা করার প্রভাব শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়াতেও দেখা যায়। ব্যক্তি জীবনে অশান্তি, নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায়, জুলুম, পারিবারিক ভাঙন ও সমাজে বিশৃঙ্খলার বড় কারণ হলো আল্লাহর নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাওয়া। যখন মানুষ ওহীর আলো হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিজের প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। ফলে তার জীবনে প্রকৃত শান্তি ও স্থিরতা থাকে না।

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো–সে ওহীকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ মানুষের কল্যাণের জন্য। কোনো বিধানের হিকমত পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও সে আল্লাহর জ্ঞানের উপর আস্থা রাখে এবং ওহীকে নিজের জীবনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে।

ওহীর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। কারণ ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয়; বরং আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশনাকে মেনে নেওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করার নাম। তাই একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা জানা, তা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং কোনো অবস্থাতেই ওহীর নির্দেশনাকে তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় মনে না করা।

যে সমাজ ওহীর অনুসরণ করে, সেখানে ন্যায়বিচার, শান্তি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে সমাজ ওহীকে অগ্রাহ্য করে, সেখানে মানুষ বাহ্যিক উন্নতি করলেও আত্মিকভাবে শূন্য হয়ে পড়ে। তাই মানুষের প্রকৃত সফলতা ও মুক্তি একমাত্র আল্লাহর ওহীর অনুসরণেই নিহিত।

লেকচার, সামাজিক প্রথা বা ব্যক্তিগত পছন্দ

বিশ্বাস বিষয়ক বিভ্রান্তির আরেকটি বড় কারণ হলো লোকাচার, সামাজিক প্রথা বা ব্যক্তিগত পছন্দকে ধর্মীয় বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া। এর ফলে মানুষ ওহীর নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যায় এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়।আরবের কাফিরগণ মূলত ওহীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না।বরং তারা বিভিন্ন অজুহাতে মুহাম্মদ সাঃ এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার ইতিহাস বিষয়টি অস্বীকার করে। তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল লোকাচার, সামাজিক প্রথা বা তাদের নিজস্ব মর্জি। এ সকল লোকাচার তারা পিতৃপুরুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ)-এর ধর্মবিশ্বাস বলে বিশ্বাস করত। এভাবেই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত অস্বীকার করে। তাদের ইবরাহিম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি কোনো জ্ঞানভিত্তিক সম্পর্ক ছিল না, বরং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা প্রচলনের উপরেই নির্ভর করত। বিভিন্ন মুসলিম সমাজের অধিকাংশ বিচ্যুতি এসব লোকাচারের ভিত্তিতেই প্রসার লাভ করেছে। পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ, নিজস্ব স্বার্থ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো একটি আকীদা বা বিশ্বাস গড়ে উঠে এবং ক্রমশ তা প্রসার লাভ করে।মানুষের জীবনে সত্য ও সঠিক পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় লেকচার, সামাজিক প্রথা কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দ বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এগুলোর অধিকাংশই মানুষের চিন্তা, অভ্যাস, আবেগ ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল; অথচ সত্যের মানদণ্ড হওয়া উচিত আল্লাহর ওহী ও সহীহ জ্ঞান। কোনো বক্তার আবেগপূর্ণ লেকচার শুনে মানুষ অনেক সময় যাচাই-বাছাই ছাড়া তা গ্রহণ করে নেয়। বক্তার জনপ্রিয়তা, সুন্দর উপস্থাপনা বা কণ্ঠের প্রভাব সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না। ফলে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল ছাড়া বক্তব্য গ্রহণ করলে মানুষ অজান্তেই ভুল আকিদা, বিদআত বা অতিরঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।

একইভাবে সামাজিক প্রথাও বহু সময় বিভ্রান্তির কারণ হয়। সমাজে প্রচলিত কোনো কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেই তা সঠিক হয়ে যায় না। অনেক মানুষ “সবাই করছে ” , “বাপ-দাদার আমল” , বা “সমাজে এটাই নিয়ম” — এই চিন্তায় এমন অনেক কাজকে গ্রহণ করে যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইতিহাসে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বহু জাতি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল শুধু পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের

কারণে। তাই সমাজের রীতি যদি কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত হয়, তবে তা পরিত্যাগ করাই ঈমানের দাবি।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দও সত্য গ্রহণে বড় বাধা হতে পারে। মানুষ স্বভাবতই এমন বিষয়কে গ্রহণ করতে চায় যা তার প্রবৃত্তি, আবেগ বা স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইসলামে সত্য নির্ধারিত হয় না মানুষের অনুভূতি বা সুবিধার উপর; বরং আল্লাহর বিধানই চূড়ান্ত মানদণ্ড। কেউ যদি নিজের পছন্দকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দেয়, তবে ধীরে ধীরে সে হক থেকে দূরে সরে যেতে পারে। এজন্য একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের মত, সমাজের চাপ কিংবা আবেগের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

সুতরাং লেকচার, সামাজিক প্রথা ও ব্যক্তিগত পছন্দ তখনই বিভ্রান্তির উৎসে পরিণত হয়, যখন সেগুলোকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা হয়। একজন সচেতন মুসলমানের উচিত প্রতিটি কথা ও কাজকে ইসলামের বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে মূল্যায়ন করা, যাতে সে বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকে সঠিক ঈমান ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

মুফাসসির বা আলেমগণের মতামত:

সকল ধর্মেই আলেমগণ বা মুফাসসিরগণ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ধর্মের বিভিন্ন বিষয় ও বিধানসমূহ নির্ধারণ করেন। তবে ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্রে, বিশেষত কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে তারা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তবে মনে রাখতে হবে, তাদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত সত্য নয়; বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসই চূড়ান্ত দলীল।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো আলেম বা মুফাসসিরের ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সঠিক হলেও, তা সব সময় সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই তাদের বক্তব্য যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তির মতামতের উপর নির্ভর না করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক।

মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হলো, বিভিন্ন আলেম ও চিন্তাবিদদের মতামতকে মূল দলীলের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ও দল গড়ে উঠেছে, যারা নিজেদের মতামতকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।

পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা বা দল সৃষ্টি হয়। যেমন–খারিজি, শিয়া, মু ‘তাজিলা, জাহমিয়া, কাদরিয়া, আশআ ‘রিয়া, মাতুরিদিয়া ইত্যাদি। এসব দলের মধ্যে আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে এবং তারা নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

কুফর

আরবী ‘কুফর’ (الكفر) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি মূল অর্থ ‘আবৃত করা’ বা ‘ঢেকে রাখা’ । বিখ্যাত ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেনঃ “(কাফ, ফা ও রা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তা হলো: আবৃত করা বা গোপন করা।” কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিচিত কাউকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তাকে ‘কুফর’ করেছেন। চাষীকে কাফির (অবিশ্বাসী) বলা হয়, কারণ তিনি বীজসমূহকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাসকে ‘কুফর’ বলা হয়, কারণ অবিশ্বাস সত্যকে আবৃত করে। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকেও কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত গোপন করা হয় এবং আবৃত করা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিশ্বাসকেই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ইসলামের কল্যাণকর বিশ্বাস না পোষণ করাই ইসলামের পরিভাষায় ‘কুফর’ বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে ঈমান না থাকে বা ঈমানের পরিপন্থী কিছু থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘কুফর’ বলা হয়।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফরকে দু’ ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (১) কুফর আকবার বা বড় কুফর এবং (২) কুফর আসগার বা ছোট কুফর। কুফর আকবার বলতে প্রকৃত

অবিশ্বাস বোঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরের পরিচয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য। আর কুফর আসগার বলতে কোনো কোনো কাফির পাপসমূহকে বা অবিশ্বাসসমূহকে নামকরণ করা হয়, তবে এসব পাপে লিপ্ত মানুষকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির গণ্য করা হয় না। তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামবাসী বলেও বিবেচনা করা হয় না। বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়।

কুফরের পারলৌকিক বিধান

কুফরের পারলৌকিক বিধান জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

যারা কুফর অবলম্বন করে এবং লোকদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না।। সুরা মুহাম্মাদ (৪৭): ৩৪]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا)

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না-তা ব্যতীত সবকিছু-যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" [সুরা নিসা (৪): ১১৬]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

নিশ্চয় যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। [সুরা নিসা (৪): ১৬৮]

মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। এ ব্যাপারে পুরো উম্মাহর ইজমা রয়েছে।

কুফরের ইহলৌকিক বিধান

ইমানের প্রথম শর্ত হচ্ছে, কুফর ও কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের প্রতি অসন্তোষ পোষণ করা। কাফিরদের আল্লাহর দুশমন মনে করা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ কোনো সম্পর্ক না রাখা। আল্লাহ বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস, আইনকানুন সব) অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যতক্ষণ-না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে। (সুরা মুমতাহিনা (৬০): ৪]

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

"যারা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসে ইমান রাখে, তাদের তুমি এমন পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখছে-হোক না তারা

তাদের বাবা, পুত্র, ভাই কিংবা তাদের স্বগোত্রীয়। তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ইমান খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রুহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেন এবং তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখো, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়। "(সুরা মুজাদালা (৫৮): ২২]

উম্মাহর মতানৈক্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল

উম্মাহর বিভক্তি-সংক্রান্ত হাদিসটি একাধিক বর্ণনাসূত্রে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তবে সবগুলো বর্ণনার সারমর্ম এক। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল বলেন,

حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل -مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى يُنْتَيْنِ ،وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً .قَالُوا :وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

বনি ইসরাইলের ওপর যে অবস্থা এসেছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের ওপরও একই অবস্থা আসবে- যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তা-ই করবে। বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল; আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামি হবে। সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, সে দল কোনটি'? তিনি বললেন, 'আমি ও আমার সাহাবিগণ যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত (যারা এর অনুসারী হবে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)'সুনানে তিরমিযি: ২৬৪

মুক্তিপ্রাপ্ত দল শুধু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত

আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তারা, যারা রাসুলের সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবিদের তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে যারা রাসুলের সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবিদের তরিকা থেকে সরে গেছে, তারা হলো আহলে বিদআত।

বিদআত শব্দটি সুন্নাহ শব্দের বিপরীত। সুন্নাহ বলা হয় সেই আদর্শকে, যা রাসুল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত। আর যে নব উদ্ভাবিত আদর্শ রাসুল এটিও তাঁর সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত নয়, তা-ই বিদআত। ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, আউলিয়া এবং আরিফিন (আল্লাহর মারিফাত অর্জনকারী) সকলেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। দীনের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত। তাঁদের পারস্পরিক ইখতিলাফ শুধুই শাখাগত ইখতিলাফ; মৌলিক ইখতিলাফ নয়।" আহল "অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী ইত্যাদি। এভাবে আমরা দেখছি যে আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা বিদ'আতের অনুসারী।

আভিধানিক ভাবে 'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রাহ, শারহু আকিদাতি ইবনি হাজিব গ্রন্থে লেখেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত-মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম এবং সুফিরা দীনের মূল বিষয়ে একমত। তাঁদের মতপার্থক্য হচ্ছে শুধু নীতিমালা ও গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে।

মুহাদ্দিসদের গবেষণা সাধারণত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমদের গবেষণা কুরআন-সুন্নাহর দলিলের পাশাপাশি যৌক্তিক প্রমাণের সঙ্গে হয়ে থাকে। তাঁরা নকল (কুরআন ও সুন্নাহ) ও আকল (বিবেকের যুক্তি)

উভয়টির আলোকে গবেষণা করেন। আর সুফিরা শরয়ি দলিল ছাড়াও ইলহাম, কাশফ এবং তাঁদের বিশেষ অবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ করেন।

আল্লাহর অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া, তিনি আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী বানিয়েছেন। বিদআতপন্থি ও প্রবৃত্তিপূজারীদের থেকে দূরে রেখেছেন। তিনি আমাদের সে পথেই পরিচালিত করেছেন, যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রাসুল এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদিন। আর এটিই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকিম।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন বলেন:

(ا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَن الإسناد فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمّوا لنا

إلى أهل السنة فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبَدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৫-৪০ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না" । মুসলিম,আসসহীহ:১/১৫

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি

আহলুস সুন্নাতের নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের মূলনীতি, তা হলো সুন্নাত ও জামা'আত। আকীদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা, আল-জামা'আত বা সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের অনুসরণ করা ও উম্মাতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা। উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের উৎস। বিদ'আতী ফিরকাগুলি কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে নি। তারা কুরআন-সুন্নাহ আকীদার উৎস বলে স্বীকার

করে। তবে আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মূল ভিত্তি। কেউ আকল, যুক্তি বা দর্শনের নামে এবং কেউ নবী-বংশের ইমামগণ, ওলীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগনের কাশফ, ইলকা, ইলহাম, ইলম লাদুন্নী, মতামত বা ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমত গ্রহণ করেছে বা ব্যাখ্যা করে পরিত্যাগ করেছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সকল নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাদের মতামতের উপর নির্ভর করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গুঢ়অর্থ নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো।মোল্লা আলী কারী লিখেছেন:

كان أبو حنيفة يكره الجدل على سبيل الحق، حتى روي عن أبي يوسف أنه قال :كنا جلوسا عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقالوا :إن
أحد هذين يقول :القرآن مخلوق، وهذا ينازعه ويقول :هو غير مخلوق قال :لا تصلوا خلفهما .فقلت :أما الأول فنعم، فإنه لا يقول بقدم القرآن .وأما الآخر فما باله

لا يصلى خلفه؟ فقال :إنهما يتنازعان في الدين، والمنازعة في الدين بدعة

"আবূ হানীফা (রাহ) সত্যের পথেও বিবাদ-বিতর্ক অপছন্দ করতেন। ইমান আবু ইউসুফ (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবু হানীফার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ দুব্যক্তিকে নিয়ে তথায় আগমন করে বলেন: এ দুজনের একজন বলছে, কুরআন সৃষ্ট এবং অন্য ব্যক্তি তার সাথে বিতর্ক করছে ও বলছে, কুরআন সৃষ্ট নয়। তিনি বলেন: এদের উভয়ের কারো পিছনে সালাত আদায় করবেন

না। আমি বললাম, প্রথম ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করব না একথা ঠিক, কারণ সে কুরআনের অনাদিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা হবে না কেন? তিনি বলেন, কারণ তারা দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক করছে আর দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক বিদ'আত।

সুন্নাতুস সাহাবা

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করাকে জান্নাত ও সফলতার পথ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর থাকাকে হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভক্তি ও মতভেদের সময় রাসূলুল্লাহ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে আরো অনেক নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে। এক হাদীসে উতবা ইবনু গাযওয়ান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم .قالوا يا نبي اللهِ أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ مِنكُمْ

"তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি তোমাদের এ পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব। (মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৪; তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর ১০/১৮২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৮২; আলবানী, সাহীহাহ ১/৮৯২-৮৯৩)

কর্ম বর্জনের সুন্নাত

'আহলুস সুন্নাত'-এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নববীতে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সুন্নাত' বলতে কী বুঝানো হয় তা জানতে হবে। এ বিষয়ে 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ -এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকুই বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নিতা না করাই সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) রাসূলুল্লাহ-এর কোনো 'কর্ম' অনুসরণ পরিত্যাগ করেন নি। রাসূলুল্লাহ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ নফল সিয়াম পালন করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর অনুসরণে নফল সিয়াম পালন করতেন। কেবলমাত্র পদ্ধতিগত সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো, তিনি এ দুটি নেক কর্ম রাসূলুল্লাহ -এর চেয়ে বেশি করতেন। রাসূলুল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় বর্জন করতেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ তা করতেন। মূল কর্ম সুন্নাত-সম্মত নেককর্ম হওয়া সত্ত্বেও কর্মের পাশাপাপশি বর্জনের ক্ষেত্রে বা পালনে ও বর্জনে হুবহু অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ আব্দুল্লাহ (*)-এর কর্মে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিন জন সাহাবী ইবাদতের আবেগে রাসূলুল্লাহ-এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন: "তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

এ হাদীসেও এ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ যা বর্জন করেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেন।

ভ্রান্ত দলসমূহ

আলিমগণ লিখেছেন, প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতপন্থিদের মৌলিক দল ছয়টি:

১. খারেজি। ২. শিয়া। ৩। কাদরিয়া (যার একটি শাখা হচ্ছে মুতাজিলা)। ৪.

মুরজিয়া। ৫. মুশাব্বিহা। ৬. জাহমিয়া।

এই প্রতিটা দলের আবার কয়েকটা করে উপদল রয়েছে, যেগুলো হিসাব করলে মোট সংখ্যা হয় ৭২। এদের সবার আকিদা সাহাবিদের আকিদা থেকে ভিন্নতর। এ কারণে এদের গোমরাহ ফিরকা বা ভ্রান্ত দল বলা হয়।শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ, বলেন, কাদরিয়া, মুরজিয়া, খারেজি ও রাফিডি এই চার ফিরকা হলো অন্য সব ফিরকা সৃষ্টির উৎস ও কারণ।
আকিদাবিশেষজ্ঞ আলিম বাতিল ফিরকাকে মৌলিক ছয় দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন: জাবরিয়া, কাদরিয়া, খারেজি, রাফিজি, মুআত্তিলা ও মুশাব্বিহা। এই ছয় দলের প্রতিটির

আবার ১২টি করে শাখা রয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে মোট সংখ্যা হয় ৭২।১০০ আর ৭৩ নম্বর দল হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

এই ফিরকাগুলোর মধ্যে কিছু ফিরকা এমন আছে, যারা ইসলামের শাশ্বত ও অকাট্য বিধান এবং জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করে। তারা কাফির এবং ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ। আর যেসব দল অকাট্যভাবে সাব্যস্ত দীনের বিধানের ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয় লালন করে না, ইসলামি ফিরকা হিসেবেই তাদের বিবেচনা করা হবে।ভ্রান্ত দলগুলোর পরিচয় বর্ণনা করা হলো:

খারেজি

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ভ্রান্ত দল খারেজি। উসমান রা.-এর খিলাফতের শেষের দিকে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উসমান রা.-এর শাসনব্যবস্থার ওপর আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে এদের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের আকিদা সাহাবিদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন। উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর তারা আলি রা.-এর মোকাবিলা করেছিল, তাঁর বায়আত ভঙ্গ করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। যুদ্ধে তাদের অনেক লোক নিহত হয়। এত কিছুর পরও আলি রা. তাদের কাফির ও ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ মনে করতেন না।

রাসুলী তাঁর জীবদ্দশায় এই দলটির আত্মপ্রকাশ ও বিদ্রোহের কথা অবগত করেছেন। হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবেও১২৬ এ সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। খারেজিরা উসমান, আলি ও মআবিয়া রা.- সবাইকেই খারাপ মনে করত। যেসব আয়াত ও হাদিসে পারস্পরিক লড়াই-হত্যা ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলো এই মহান সাহাবিদের ওপর প্রয়োগ করত। খারেজিদের সর্বসম্মত আকিদা হলো, উসমান, আলি, আয়িশা, মুআবিয়া, জুবায়ের ও তালহা রা. কাফির। (নাউজুবিল্লাহ)

শিয়া ও রাফিজি

খারেজিদের আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই শিয়াদের উত্থান ঘটে। তারা নিজেদের আলি রা.-এর পক্ষের লোক দাবি করে এবং নিজেদের নাম শিইয়ানে আলি বলে প্রচার করে। কিছু শিয়া আলি রা.-এর ভালোবাসায় এত বাড়াবাড়ি করেছিল যে, তারা আলি রা.-কে ইলাহ ভাবতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলো জিনদিক ছিল, যারা নিজেদের বাহ্যত মুসলমান বলে পরিচয় দিত। আলি রা. প্রথমে তাদের বুঝিয়ে এই ভুল আকিদা লালন করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর কথা শোনেনি। ফলে তিনি তাদের হত্যা করেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাদের লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন।

এই দলের নাম ছিল সাবায়ি ফিরকা। তাদের প্রধান ছিল ইয়াহুদি আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। তারা আলি রা.-এর উলুহিয়াতের প্রবক্তা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, আলি রা. থেকে যে বিস্ময়কর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা সব ইলাহেরই বৈশিষ্ট্য, যা মানবীয় রূপ ধারণ করে এভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দল নিঃসন্দেহে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ।

সাধারণভাবে শিয়াদের সর্বসম্মত আকিদা হলো, রাসুল-এর পর প্রকৃত ইমাম ছিলেন আলি রা.। ইমাম হওয়ার বিষয়টি কখনো আলি রা.-এর সন্তানদের থেকে বাইরে যেতে পারবে না। তাঁর বংশীয় লোক ছাড়া অন্য কেউ যদি ইমাম হয়, তবে তা অন্যায়, জুলুম ও ছিনতাইয়ের দ্বারাই হবে।

কাদরিয়া ও জাবরিয়া

সাহাবিদের শেষ জামানায় কাদরিয়া ফিরকার উদ্ভব হয়। তারা আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদির অস্বীকার করে বসে। তাদের আকিদা হলো, কাজা (ফায়সালা) ও তাকদির বলে কিছু নেই। বান্দা নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। সে নিজেই নিজের কাজের স্রষ্টা। পূর্ব থেকে কোনো কিছু নির্ধারিত নেই। এমনকি আল্লাহও পূর্ব থেকে বান্দার কাজের ব্যাপারে অবগত নন। বান্দা কাজ করার পর আল্লাহ সে ব্যাপারে অবগত হন।

মাবাদ জুহানি, গাইলান দিমাশকি এবং জাদ ইবনু দিরহামের হাত ধরে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সকল সাহাবির যুগে এই ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাঁরা এদের সঙ্গে সম্পর্ক-ছিন্নের ঘোষণা দেন এবং এদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উমর, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আনাস ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা এবং উকবা ইবনু আমির রা. তাঁদের সঙ্গীদের এই ওসিয়ত করেছিলেন, তারা যেন কাদরিয়াদের সালাম না দেয়, তাদের জানাজার সালাত না পড়ে এবং তাদের অসুস্থদের দেখতে না যায়।

কাদরিয়াদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম থেকে খারিজ। পক্ষান্তরে যারা বান্দাকে নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে, তাদের নিজেদের কাজের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে, তারা ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ নয়।।

কাদরিয়াদের উত্থানের অব্যবহিত পরে তাদের পুরো বিপরীত জাবরিয়া ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের আকিদা হলো, মানুষ গাছ ও পাথরের মতো একান্ত বাধ্যগত। আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদির বান্দাকে যে দিকে নিয়ে যায়, সে-ও বাধ্য হয়ে সে দিকেই যায়। তার নিজের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। সুতরাং বান্দা যা-ই করুক না কেন, তার কোনো শাস্তি হবে না। কারণ, সে নিজ ইচ্ছায় এগুলো করছে না।

মুতাজিলা

তাবিয়িদের শেষ যুগে এই ফিরকার উদ্ভব ঘটে, যারা দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা করত। তারা বলত, আখিরাতে আল্লাহর দর্শন-লাভ অসম্ভব। কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলে বান্দা না মুমিন থাকে; আর না কাফির হয়ে যায়। তারা ইমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী আরেকটা স্তরের কথা বলে। ওয়াসিল ইবনু আতা এই ফিরকার প্রবর্তক। হাসান বসরি রাহ. তাকে তাঁর মজলিস থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করে বলেন, اعتزل عنا। 'তুমি আমাদের থেকে "মুতাজিল" (বিচ্ছিন্ন) হয়ে যাও।'

হাসান বসরির এ কথার প্রেক্ষিতেই তাদের নামকরণ করা হয় মুতাজিলা। আকিদার বিস্তৃত গ্রন্থগুলোতে তাদের মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই মুতাজিলা ফিরকা থেকে আবার ২০টি শাখা বেরিয়েছে, যাদের কোনোটিকে তাকফির করা হয়।

মুতাজিলা ফিরকা মূলত কাদরিয়া ফিরকারই একটি শাখা। তাদের অবস্থান খারেজি এবং মুরজিয়ার মাঝামাঝি। মুতাজিলারা মুরজিয়াদের মতো নাফরমানি ও কবিরা গুনাহকে ইমানের জন্য ক্ষতিকর নয় মনে করে না। আবার তারা খারেজিদের মতো কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফিরও আখ্যায়িত করে না। তাদের বক্তব্য হলো, কবিরা গুনাহকারী মুমিন নয়, আবার কাফিরও নয়; বরং ইমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী এক অবস্থানে দণ্ডায়মান।

মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা

মুশাব্বিহা অর্থ সাদৃশ্যবাদী। এই ফিরকা সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সাদৃশ্য প্রদান করে। চরমপন্থি মুশাব্বিহারা বলে, আল্লাহ দেহবিশিষ্ট সত্তা। আমাদের মতো তাঁরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। তাঁর চেহারা আছে, হাত আছে, পা আছে এবং পায়ের গোছাও আছে। তিনি আরশের ওপর সমাসীন।

মধ্যপন্থি মুশাব্বিহারাও আল্লাহর জন্য চেহারা, হাত, পা ও গোছা সাব্যস্ত করে; তবে তারা এর সঙ্গে এ কথা যোগ করে, তাঁর চেহারা আমাদের চেহারার মতো নয়। তাঁর পা আমাদের পায়ের মতো নয়। তাঁর গোছা আমাদের গোছার মতো নয়।

আকিদাবিশেষজ্ঞ আলিমগণের পরিভাষায় এই মধ্যপন্থি মুশাব্বিহাদের নাম হলো হাশাওয়ি ফিরকা। তারা কুরআন-সুন্নাহর নুসুসের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরতেই চায় না। তবে সাদৃশ্যবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ভুল আকিদার সঙ্গে 'তাঁর অনুরূপ কোনো কিছু নেই' যোগ করে দায় সারতে চায়।

মুশাব্বিহা ফিরকার বিপরীতে রয়েছে মুআত্তিলা ফিরকা। তারা আল্লাহর সিফাতসমূহ (গুণ) অস্বীকার করে। তাদের কথা হলো, সিফাত অস্বীকারের নাম তাওহিদ; আর সিফাত সাব্যস্ত করা শিরক।

মুরজিয়া

মুতাজিলার পর মুরজিয়া ফিরকার উদ্ভব হয়। তাদের বক্তব্য হলো, শুধু ইমান আনাই যথেষ্ট; নেক আমল আবশ্যক নয়। কেউ ইমান আনলে গুনাহ আর তার কোনো ক্ষতি করে না। মুরজিয়াদের দৃষ্টিতে ইমানের হাকিকত শুধু আল্লাহর মারিফাত (পরিচয়) এবং তাঁর ভালোবাসা। মুক্তির জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট; ইবাদত ও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই।

জাহমিয়া

আব্বাসি খিলাফতের সময় জাহম ইবনু সাফওয়ানের হাত ধরে জাহমিয়া ফিরকার উদ্ভব ঘটে। জাদ ইবনু দিরহাম ছিল তার সহযোগী। তারা আল্লাহর সিফাতসমূহ অস্বীকার করত এবং কুরআন মাজিদকে অনিত্য (নশ্বর) বলত। তারা বলত, যদি আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে একাধিক চিরন্তন সত্তাকে মেনে নিতে হয়, যা কিনা তাওহিদবিরোধী।
এই ফিরকা মূলত মুআত্তিলা ফিরকারই একটি শাখা। তারা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আকিদা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়। আব্বাসি খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ এবং মুতাসিম বিল্লাহও তাদের ভ্রান্ত আকিদায় বিভ্রান্ত হন।

অধ্যায়-৬:ঈমানী আকাইদ ও আহকামের স্পষ্ট ঘোষণা

ঈমানী আকাইদ ও আহকাম অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করা এবং বিরুদ্ধ প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু বানানো যেমন কুফর তেমনি এগুলোর কোনো একটিরও এমন কোনো 'ব্যাখ্যা' করাও সরাসরি কুফর, যার দ্বারা তার প্রতিষ্ঠিত অর্থই বদলে যায়। কোনো কিছুর অপব্যাখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ঐ বিষয়টি অস্বীকারের ভয়াবহতম প্রকার। ঈমানের বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ হতে সেগুলোর কোনো অর্থ নির্ধারণ করে, কিংবা কোনো বেদ্বীনের নবউদ্ভাবিত অর্থ গ্রহণ করে ঈমানের দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

'ব্যাখ্যা' তো ঐখানে হয় যেখানে ভাষার বাকরীতি ও মর্মোদ্ধারের নীতিমালা অনুযায়ী একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যেখানে কোনো বিধান বা বিশ্বাসের অর্থ ও মর্ম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অসংখ্য মুমিনের সুসংহত সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসে এবং যাতে প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐকমত্য বিদ্যমান থাকে সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে কীভাবে? সেখানে তো ঐ অর্থই নিশ্চিত ও নির্ধারিত। ওখানে ভিন্ন 'ব্যাখ্যার' অর্থ ঐ অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করা।

যেমন কেউ বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু তা পাঁচ ওয়াক্ত নয়, দুই ওয়াক্ত।' কিংবা বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু আসল নামায তা নয়, যা মুসল্লিগণ মসজিদে আদায় করেন, আসল নামায তো মনের নামায। যে তা আদায় করতে পারে তার দেহের নামাযের প্রয়োজন নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, 'শরীয়ত সত্য, কিন্তু তা আম বা সাধারণ মানুষের জন্য, খাস বা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আছে আলাদা শরীয়ত।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, 'শরীয়ত তো প্রাচীন যুগের ব্যাপার, আজকের উন্নতির যুগে এর সংস্কার প্রয়োজন।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, "শরীয়ত মানা একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। মানলে ভালো, না মানলেও দোষ নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতো বলল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও খাতামুন্নাবিয়্যীন। তবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নবী, তিনি জিল্লী বা বুরুজী নবী। এর দ্বারা খতমে নবুওতের আকীদায় কোনো ধাক্কা লাগে না।' (নাউযুবিল্লাহ)।

তো এইসব কুফরী 'ব্যাখ্যা' এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য 'ব্যাখ্যা', যার আবরণে বেদ্বীন-মুলহিদ চক্র 'জরুরিয়াতে দ্বীন' (দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) ও 'কাওয়াতিউল ইসলাম' (ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি)-এর অস্বীকার করে এবং সেই কুফরীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা করে, এর দ্বারা তো তাদের কুফরী আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। 'অস্বীকারে'র সাথে 'অপব্যাখ্যা' যুক্ত করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির- মুলহিদ, যিনদীক ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহ তাআলার এই হুঁশিয়ারি এদের সকলের মনে রাখা উচিৎ-

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ايْتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي مِنَّا يَوْمَ الْقِيمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে-যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। -হা-মীম আসসাজদা ৪১:৪০

দ্বীনকে অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা 'সাবীলুল মুমিনীন'কে মানদণ্ড বানিয়েছেন। এবং 'সাবীলুল মুমিনীন' (মুমিনের সর্বসম্মত পথ) থেকে বিচ্যুতিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধতার মতো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে কোনো ইসলামী আকীদা বা হুকুমের (বিশ্বাস বা বিধানের) এমন সকল 'ব্যাখ্যা'র গন্তব্য জাহান্নাম, যা উম্মাহর সর্বসম্মত 'ব্যাখ্যার' বিরোধী।

وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًان

* কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকেই সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস! -আন নিসা ৪: ১১৫।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের কাছে আল্লাহ তাআলার এই মানদণ্ড পছন্দনীয় নয়।
মুমিনদের মতো ঈমান আনে না, নিজেদের মনমতো ঈমান আনে। এরা মুমিনদের মনে করে বুদ্ধিহীন। আজও আমরা একই প্রবণতা লক্ষ করছি-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا مَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَ لكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? জেনে রাখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

* যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

* আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন।

* এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। -সূরা আল বাকারা ২: ১৩-১৬

তাওহীদই ঈমানের সবচেয়ে বড় রুকন

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে 'ঈমান বিল্লাহ' (আল্লাহর উপর ঈমান)। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাঁকেই 'রব' ও সত্য মাবুদ বলে মানা, রুবুবিয়্যত ও উলুহিয়্যতের বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সব বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল কুশা (সংকট মোচনকারী) বিপদাপদে তাঁকেই ত্রাণকারী মনে করবে। তাঁর বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক করবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তা দান করেন। রিযিকদাতা একমাত্র তিনি। গোটা জগতের এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও তিনিই। শীয়ত দান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ তাঁরই অধিকার। এতে কাউকে শরীক করবে না-না কোনো ইজম বা মতবাদকে, না কোনো নেতা বা দলকে, না রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কে। মোটকথা, তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। আল্লাহ তাআলার কাছে মুশরিকের ঈমান ঈমানই নয়। মুশরিককে তিনি কখনো মাফ করেন না।

'তাওহীদ' শব্দটি আরবী 'ওয়াহাদা ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'এক হওয়া', 'একক হওয়া' বা 'অতুলনীয় হওয়া'। তাওহীদ অর্থ 'এক করা', 'এক বানানো', 'একত্রিত করা', 'একত্বের ঘোষণা দেওয়া' বা 'একত্বে বিশ্বাস করা'। তাওহীদের ব্যবহারিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লিখিত তাওহীদের পরিচিতি আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলিতে তাওহীদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: لا إله إلا الله"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।" বিভিন্ন বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে: وحده لا شريك له"তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।" আমরা প্রথমে এ বাক্যটির বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করব।

আরবীতে (য়) শব্দের অর্থ হলো নেই, মোটেও নেই বা একেবারে নেই। এই বাক্যে শব্দটি বা মোটেও নেই বা একেবারেই নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(০لآ) শব্দের অর্থ হলো "মাবুদ", অর্থাৎ উপাস্য বা পূজ্য, যার কাছে মনের আকুতি পেশ করা হয়, প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিধ ও অভিধান-প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন:

الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد، فالإله الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود

"হামযা, লাম ও হাইলাহ: ধাতুটির একটিই মূল অর্থ, 'তা হলো ইবাদত করা। আল্লাহ ইলাহ কারণ তিনি মাবুদ বা ইবাদতকৃত।"*

'মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬

আরবী ভাষায় সকল পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই 'ইলাহ' বলা হয়। এজন্য সূর্যের আরেক নাম 'ইলাহাহ' الإلاهة; কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের উপাসনা বা পূজা করত। মহান আল্লাহ বলেন:

وقال الملأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنذَر مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ

"ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে দিবেন?"

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এখানে 'আলিহাতাকা (এ) স্থলে 'ইলাহাতাকা' পড়তেন। 'ইলাহাত' অর্থ ইবাদত, অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে আপনাকে এবং আপনার ইবাদত করা বর্জন করতে দিবেন?"

এভাবে আমরা দেখছি যে, (ইলাহাহ) শব্দটি আরবীতে (ইবাদাহ)

মুশরিকের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার অভিযোগ তো এটাই যে, সে ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে।

وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هُذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ

مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহয় বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।

* তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?

* বল, 'এটাই আমার পথ আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।' -সূরা ইউসুফ (১২): ১০৬-১০৮

আল্লাহ তাআলার দাবি সবসময় এটাই যে, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান যেন' খাঁটি তাওহীদের সাথে হয় এবং সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে পাক সাফ হয়। আল্লাহ বলেন

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

বল, 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদত করার;

* আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।' -সূরা আযযুমার (৩৯): ১১-১২

তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচ্য এবং সকল আলোচনার মূল বিষয়। ইমাম আবু হানীফার (রা) 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, তাওহীদের আলোচনাকালে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন:

"তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায়। (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ স্বীকার করার অর্থই তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করা।) কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করলে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ স্বীকার করা হয় না।...

কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াত এই দুই প্রকারের তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত। বরং সত্যিকার বিষয় যে, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই এই দুই প্রকারের তাওহীদের বিবরণ।

সূরা (৭) আরাফ: ৭৩ আয়াত।

কারণ কুরআনে কোথাও আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে, আর এগুলি জ্ঞান ও সংবাদের তাওহীদ। আর কোথাও শিরক-মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় সব কিছু বর্জন করতে আহ্বান করা হয়েছে। এ হলো 'আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী' বা 'ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব' (ইবাদতের তাওহীদ)।

আর কোথাও আদেশ, নিষেধ ও আল্লাহ আনুগত্য বজায় রাখার বর্ণনা রয়েছে। এগুলি তাওহীদের দাবি ও পরিপূরক। আর কোথাও তাওহীদের অনুসারীদের সম্মান-মর্যাদার কথা, দুনিয়াতে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদেরকে কিভাবে সম্মানিত করা হবে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদের পুরস্কার। আর কোথাও শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, পৃথিবীতে তাদেরকে কি লাঞ্ছনা প্রদান করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের জন্য কি শাস্তি ও যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে তা বলা হয়েছে। এ হলো তাওহীদ থেকে বাইরে যাওয়ার প্রতিফল। কাজেই কুরআনের সকল আলোচনাই তাওহীদ কেন্দ্রিক।"

তাওহীদের বিপরীত শিরক

আরবীতে শিরক (شرك) অর্থ অংশীদার হওয়া । ‘শারীক’ (شريك) ও ‘শারীক’ (الشريك) শব্দ দু’ টি অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে ‘শিরক’ শব্দটিকে আরবীতে অংশীদার করা বা ‘শরীক বানানো’ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা ইবাদতের প্রাপ্য কোনো বৈশিষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে ‘আল্লাহর সমতুল্য’ করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।” সূরা বাকারা (২): আয়াত ২২

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন,

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِندَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বললেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” বুখারী আস-সহীহ ৪/১৬২৬,৫/২২৩৬,৬/২৪৯৭,মুসলিম আস- সহীহ ১/৯০-৯১

এভাবে আমরা দেখি যে কাউকে যখন আল্লাহর ‘নিদ্দ’ মনে করাই বা কুরআনের ভাষায় ‘নিদ্দ’ (نِدّ) অর্থ সমতুল্য মনে করা হয় তখনই তাকে আল্লাহর শরীক, অংশী, শিরক বা ইলাহরূপে গণ্য করা হয়। অন্যভাবে, আল্লাহ যে গুণে প্রশংসিত হন বা আল্লাহর জন্য যা নির্দিষ্ট করা হয় তা অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করাই শিরক।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য: প্রথমত, কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনোভাবে আল্লাহর সমকক্ষ বা তুল্য মনে করার অর্থ তার একত্বে অবিশ্বাস বা তাঁর অনন্যত্ব অস্বীকার করা এবং একইসাথে দাসত্বেও অবিশ্বাস। আর কেউ শিরক করতে পারে না। কারণ শিরকের অর্থ তাওহীদী ও রিসালাতের অনুশাসন

অস্বীকার করা। অন্যদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মেনে ঈমানে কোনো ত্রুটি বা অবিশ্বাস করলে তা কুফর বলে গণ্য। যেমন যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব বা তাঁর প্রতিপালনে একত্বে অবিশ্বাস করেন বা মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত, আখিরাত, ফিরিশতা ইত্যাদি অস্বীকার করেন তবে তা কুফর হবে, তবে তা শিরক নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সরাসরি কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরও এক ধরনের শিরক বটে। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে একত্বের মূল ভিত্তিকে যখন আল্লাহ যত অনন্য-অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করেছে, বিপরীতে কোনো প্রকৃতি বা অন্য শক্তিকে বিশ্বাস করেছে।

শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা। হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে তাগ করেছেন। শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক। তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।ভয়াবহতা অনুসারে শিরক ২ প্রকার যথাঃ

(১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরকে আসগর বা ক্ষুদ্রতর শিরক

তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তাওহীদের বিপরীতই শিরক। এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা হয়।

প্রতিপালনের শিরক

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিষক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রুবুবিয়্যাত বা রুবুবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে।

নাম ও গুণাবলির শিরক

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

ইবাদতের শিরক

'ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে 'ইবাদতের শিরক' বলা হয়। ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত তক্তি-বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক।

শিরকে আসগার

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে

প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শিরক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ক্রোধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তার নিকট চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে শিরক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। পক্ষান্তরে শিরক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবুবিয়্যাও বা উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম।

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ এক বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের

মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসহগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ রিয়াকে 'শিয়ক আসগার' অর্থাৎ 'ছোট শিরক' বা 'শিরক খাফী' অর্থাৎ 'কৃষ্ণয়িত শিরক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالُوا وَمَا الشرك الأصفر يَا رَسُولَ الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامةِ إِذا جرى النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذهبوا إلى الذين كنتم ترامون في الدنيا فانظروا هَلْ تَجِدُونَ عِندَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন। হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কিনা" ।
আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৬২৮-৪২৮ হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২।

ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকছি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠায় লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরূপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাগা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে,

ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে... ইত্যাদি। এরূপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা 'শিরক আকবার' বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোনো কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান। অমুক কারণটি না হলে কার্যটি হতো না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার করণে অমুক কাজটি হয়েছে। রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলভে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে।

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বাসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের মানুষই একমত। কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিনায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওলীলাগুলি অন্য বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শিরক আকবার বা শিরক আসগার হতে পারে।

শিরকের অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না

শিরক ইসলামে সবচেয়ে বড় এবং ভয়াবহ গুনাহ। কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদত করার জন্য। কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো কাছে সাহায্য চায়, অন্য কারো নামে মানত করে, বা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তখন সে শিরকের মতো মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে শিরকের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে এ ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

– সূরা আন-নিসা : ৪৮

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, শিরক এমন অপরাধ যা তওবা ছাড়া ক্ষমা করা হবে না। একজন মানুষ জীবনে যত গুনাহই করুক না কেন–যদি সে আন্তরিক তওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার জন্য মুক্তি নেই। কারণ শিরক সরাসরি আল্লাহর অধিকার নষ্ট করে।

রাসূল ﷺ-ও শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, একবার রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?" তখন তিনি বলেন–

"তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

– সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৪৭৭

– সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮৬

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, শিরক সব গুনাহের চেয়েও বড় অপরাধ। কারণ এটি মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

শিরকের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো–এটি মানুষের সমস্ত নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। কেউ যদি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ করে, দান-সদকা করে, কিন্তু তার মধ্যে শিরক থাকে, তাহলে সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন–
"যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যেত।"
– সূরা আল-আনআম : ৮৮

অর্থাৎ শিরক মানুষের জীবনের সমস্ত ইবাদত ও সৎকর্মকে বরবাদ করে দিতে পারে। এজন্য একজন মুসলমানের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত শিরক থেকে।
বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ না বুঝেই বিভিন্ন ধরনের শিরকের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কবর বা মাজারের কাছে গিয়ে এমনভাবে সাহায্য চায় যেন সেই ব্যক্তি সবকিছু দিতে পারে। কেউ তাবিজকে আল্লাহর চেয়ে বেশি কার্যকর মনে করে। কেউ আবার জ্যোতিষী বা গণকের কথাকে সত্য মনে করে ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এসব কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
রাসূল ﷺ বলেছেন–
"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
– সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৯৩
এই হাদীস মানুষের জন্য বড় সতর্কবার্তা। কারণ শিরক শুধু একটি গুনাহ নয়; এটি এমন অপরাধ যা মানুষকে চিরস্থায়ী শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের আকিদা ও বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ রাখা এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।
তবে আল্লাহর রহমত অত্যন্ত ব্যাপক। কেউ যদি শিরক করার পর আন্তরিকভাবে তওবা করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে শিরক না করার দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। এজন্য জীবিত থাকা অবস্থায় তাওহীদের উপর অটল থাকা এবং সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

সবশেষে বলা যায়, শিরক এমন এক ভয়াবহ অপরাধ যা মানুষের ঈমান, আমল ও আখিরাত—সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মেনে চলা, শুধুমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের শিক্ষা অনুসরণ করা। তাহলেই একজন মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়

শিরক থেকে বেঁচে থাকা একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। কারণ শিরক এমন একটি গুনাহ যা মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয়, আমল ধ্বংস করে দেয় এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হয়। তাই একজন মুমিনের উচিত সবসময় সতর্ক থাকা, যেন কোনোভাবে সে শিরকের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। শিরক থেকে বাঁচার জন্য শুধু মুখে ঈমানের দাবি করাই যথেষ্ট নয়; বরং সঠিক আকিদা, বিশুদ্ধ আমল ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস গড়ে তুলতে হয়।

শিরক থেকে বাঁচার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। তাওহীদ মানে হলো আল্লাহকে একক হিসেবে মানা-তিনি একাই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। যখন একজন মানুষ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানবে, তখন তার অন্তরে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যা তাকে শিরক থেকে দূরে রাখবে। অজ্ঞতার কারণেই মানুষ অনেক সময় না বুঝে শিরক করে ফেলে। কেউ মনে করে পীর সাহেব সবকিছু দিতে পারেন, কেউ মনে করে কোনো তাবিজ নিজে থেকে বিপদ দূর করতে পারে, আবার কেউ মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়। এসব ভুল বিশ্বাসের মূল কারণ হলো তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"সুতরাং জেনে রাখ, অল্লাহ হাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।"
- সূরা মুহাম্মাদ: ১৯

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন তিলাওয়াত করা, তার অর্থ বোঝা এবং সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করা।

শিরক থেকে বাঁচার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো সব ধরনের ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। ইবাদত শুধু নামাজ বা রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দোয়া করা, ভয় করা, আশা করা, ভরসা করা, মানত করা, কুরবানী করা-এসবও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলমানের অন্তরে এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, উপকার ও ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই বিপদে পড়লে শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

অনেক মানুষ কবর, মাজার বা কোনো পীরের কাছে গিয়ে এমনভাবে সাহায্য চায় যেন তারা অদৃশ্যভাবে সবকিছু করতে পারে। এটি অত্যন্ত ভয়াবহ শিরক। কারণ গায়েবের জ্ঞান ও সর্বশক্তির অধিকারী শুধু আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই।"

- সূরা আল-আনআম : ১৭

এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, মানুষের আসল ভরসা ও নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহর উপর হওয়া উচিত।

শিরক থেকে বাঁচার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো কুসংস্কার ও বিদআত থেকে দূরে থাকা। সমাজে অনেক প্রচলিত কাজ আছে যা মানুষ ধর্ম মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই। যেমন-তাবিজ ঝুলানো, ভাগ্য জানার জন্য জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া, "অমুক দিন অশুভ" মনে করা, পীরের নামে মানত করা, বা মৃত ব্যক্তির রূহ এসে সাহায্য করতে পারে-এমন বিশ্বাস রাখা। এসব ধীরে ধীরে মানুষের ঈমান নষ্ট করে দেয়।

রাসূল বলেছেন-

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ-এর উপর অবতীর্ণ বিধানের সাথে কুফরি করল।"
- মুসনাদ আহমদ
এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ভবিষ্যৎ জানার দাবি বা গায়েবের উপর মানুষের বিশ্বাসকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

শিরক থেকে বাঁচতে হলে একজন মুসলমানকে নিজের আমলের নিয়তও বিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ অনেক সময় মানুষ লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে। যেমন-মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য নামাজ পড়া, দান করা বা ভালো কাজ করা। এটিকে "রিয়া" বলা হয় এবং এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল বলেছেন-

"আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।"

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, "রিয়া বা লোক দেখানো আমল।"

- মুসনাদ আহমদ

তাই প্রতিটি আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।
শিরক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সৎ ও নেককার মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালো মানুষের সঙ্গ ঈমান বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর পথে চলতে সাহায্য করে। অন্যদিকে খারাপ সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে ভুল আকিদা ও গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। তাই এমন বন্ধু ও পরিবেশ বেছে নেওয়া উচিত যেখানে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা দেওয়া হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-সবসময় আল্লাহর কাছে হিদায়াত ও নিরাপত্তা কামনা করা। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহর হাতে। একজন মানুষ কখনোই নিজের ঈমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাই রাসূল নিজেও আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এবং উম্মতকে শিখিয়েছেন-

"হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আশ্রয় চাই এবং না জেনে যা করেছি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"

এই দোয়া নিয়মিত পড়া একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

শিরক থেকে বাঁচার জন্য বিশুদ্ধ তাওহীদ অর্জন, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুসরণ করা, কুসংস্কার ও বিদআত থেকে দূরে থাকা, নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা এবং আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা অত্যন্ত প্রয়োজন। একজন মানুষ যত বেশি আল্লাহকে চিনবে ও তাঁর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করবে, তত বেশি সে শিরক থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের ঈমান ও আকিদা রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা।

অধ্যায়- ৭: বিদ'আত

বিদ'আত শব্দটি আরবী 'বাদা'আ' (১) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ইসম। বাদ'আ অর্থ নব-উদ্ভাবন বা অন্যস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান (Innovation) বিদ'আত অর্থ নব-উদ্ভাবিত বিষয়।' ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু দুরাইদ (৩২১ হি) বলেন, "বাদা'আ অর্থ কোনো কিছু শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 'বাদী', অর্থাৎ উদ্ভাবক ও অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব-দাতা বা সৃষ্টিকর্তা। যে ব্যক্তি কোনো বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে ভার বিদ'আত-কারী বা উদ্ভাবক। ইসম 'বিদ'আত'।""

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন:

والباعة الحدث في الدين بعد الإكمال

"আল-বিদ'আত অর্থ পূর্ণতার পয়ে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন।""জাওহারী,আস সহিহ - ৩/১১৮৪

ফাইরোষ-আবাদী (৮১৭ হি) বলেন।

: والبلاغة بالكسر :الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استخت بعد النبي

من الأقواء والأعمال

বিদ'আত পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন, অথবা রাসূলুল্লাহ প্রদ্র-এর পরে যে মতবাদ বা কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে। ইবনু মানসূরও অনুরূপ বলেছেন।" (ফাইরোযাবাদি,আল কূমুসলু ২/২৫২)

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৭৯০ হি) আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলেন:

البدعة وهي كما في المغرب اسم من ابتدع الأمر ما اداه وأخدته ثم علمت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه، وعرفها السمني بأنها ما أحدث على خلاف الحق المنفى عن رسول الله من علم أو عمل أو حال نوع شبهة واستضان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما.

"আল-মুগরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিদ'আত শব্দটি 'ইবতাদ'আ' ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম। ফিলটির অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ'আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভকরে।' শুথানী বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেন। 'রাসূলুল্লাহ স্ত্রি থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ভাল মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ'আত'।""
(ইবনু নুযাইক,আল বাহরুর রাইক শারহু কানযিদ দাকাইক ১/৬১১)

আল্লামা ইবরাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি) বলেন।

فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشراعية، يقصد بالسلوك عليها البالغة في التعبد الله سبحانه

"বিদ'আত বলতে বুঝায় দীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতির তুল্য কোনো নব-আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত তরীকা বা পদ্ধতি মহান আল্লাহর অতিরিক্ত ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।""(শাতিবী, আল ইতিসাম ১/৫০)

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতের পরিচয়ে বলেন:

وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرَّسُول لا بمعاندة بل بنوع شبهة

"বিদ'আত হলো, রাসূলুল্লাহ ড্র থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোনো বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা।"ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬০

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার আগ্রহে কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে পারেন না। মহান আল্লাহ খৃস্টানদের বিষয়ে বলেন।

খৃস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমুখি হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। আবার খৃস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি না করে সংসার-বিরাগী হতে কোনো নিষেধও ছিল না। ধার্মিক খৃস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা 'রাহবানিয়্যাহ' বা সন্ন্যাসবাদ প্রতি উদ্ভাবন করে। তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিসাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে রীতি আবিষ্কার করা। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খৃস্টান মাগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।

কুরআন কারীমে বিদ'আত

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার

আগ্রহে কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে পারেন না। মহান আল্লাহ খৃস্টানদের বিষয়ে বলেন।

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليْهِمْ إلا ابْتِغَاء رَضْوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا

حق رعايتها

"কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।"
সূরা হাদীদ : আয়াত ২৭

খৃস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমুখি হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। আবার খৃস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি না করে সংসার-বিরাগী হতে কোনো নিষেধও ছিল না। ধার্মিক খৃস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা 'রাহবানিয়্যাহ' বা সন্ন্যাসবাদ প্রতি উদ্ভাবন করে। তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিসাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে রীতি আবিষ্কার করা। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খৃস্টান মাগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।

হাদীসে নববীতে বিদ'আত

আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক অর্থে বিদ'আত অর্থ খারাপ কিছু নয়; নব-উদ্ভাবিত বিষয় ভাল বা খারপ হতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছ) ধর্মের বিষয়ে নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত নিন্দনীয় বলে জানرعايته
আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু শুধু মানবীয় জ্ঞানের

উপর নির্ভর করে মহান স্রষ্টার কর্ম ও বিশেষণের প্রকৃতি, তাঁর সন্তুষ্টির পথ, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এজন্য এ সকল বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয়। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ নবী-রাসুলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব প্রদান করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওহীর বাইরে কোনো ধর্মীয় মতামত তৈরি করা, ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম উদ্ভাবন করা ধার্মিক মানুষের জন্য শয়তানের প্রবঞ্চনার দরজা খুলে দেয়। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ উন্মাতকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করেছেন।

ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা কাংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ (রা) দুটি নেককর্মে পদ্ধতিগতভাবে রাসুলুল্লাহ -এর ব্যতিক্রম করতেন। রাসূলুল্লাহ রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছু দিনে সিয়াম পালন করতেন, পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় করতেন। বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। এরপর তিনি বলেন। প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি:

(১) তাহাজ্জুদ ও নফল সিয়াম ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিভিন্ন হাদীসে এ ইবাদত বেশি বেশি পালন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ ইবাদত যত বেশি পালন করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে। কাজেই অর্ধেক রাতের চেয়ে সারারাত তাহাজ্জুদে সাওয়াব বেশি হওয়ার

কথা। অনুরূপভাবে মাসের কয়েকদিন সিয়াম পালনের চেয়ে পুরো মাস সিয়াম পালনে বেশি সাওয়াব হওয়ার কথা।

(২) সারারাত তাহাজ্জুন যা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে তা রাসূলুল্লাহ প্র-এর পদ্ধতির বাইরে।

(৩) এরূপ করাকে রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতি অপছন্দ করার নামান্তর বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

(৪) তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক নয়। তবে তার স্থিতি

যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে। (৫) তিনি তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদতেেক বিদ'আত বলেছেন।

অন্যান্য অনেক হাদীসে এভাবে বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'নব-উদ্ভাবন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব আলোচনাকালে এ অর্থের অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ স্ত্রি বলেছেন: "আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে। কাজেই তোমার দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার। নব উদ্ভাবিক কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে। কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা বা গোমরাহী।"

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম সাঃ বলেছেন

إن استدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأمور مكتاتها عة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

"সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা এবং সকল পথভ্রষ্ঠতা জাহান্নামের মধ্যে।"নাসাঈ আস সুনান ৩/১৮৮

বিভিন্ন ধরনের বিদ'আতের উদাহরণ

বিদআত বলতে দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় সংযোজন করাকে বোঝায়, যা ইসলামের মৌলিক উৎস–কুরআন ও সুন্নাহ–দ্বারা প্রমাণিত নয়, অথচ তা সওয়াবের কাজ বা দ্বীনের অংশ হিসেবে পালন করা হয়। বিদআত বিভিন্ন রকম হতে পারে। নিচে কিছু প্রচলিত বিদআতের উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

আকিদাগত বিদআত

এ ধরনের বিদআত ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন–

১.আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

২.মৃত ব্যক্তি বা পীর-আওলিয়াদের গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা।

৩.কবরবাসীদের বিপদ দূর করার ক্ষমতা আছে মনে করা।

৪.তাবিজ-কবজকে নিজস্ব ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা।

ইবাদতে বিদআত

১.ইবাদতের পদ্ধতি, সময় বা সংখ্যা পরিবর্তন করে নতুন কিছু চালু করা। যেমন–

নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া বিশেষ রাতে বিশেষ নামাজ বা ইবাদতকে বাধ্যতামূলক বা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ মনে করা।

২.যিকির বা দরূদের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত নয় এমন নির্দিষ্ট সংখ্যা ও পদ্ধতি আবশ্যক বানিয়ে নেওয়া।
৩.রাসূল ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ইবাদত করেননি, সেভাবে নতুন নিয়ম তৈরি করা।

সামাজিক ও অনুষ্ঠানভিত্তিক বিদআত

১.সমাজে ধর্মীয় আমল হিসেবে কিছু নতুন রীতি চালু করা। যেমন–
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা।

২.কবরের ওপর আলোকসজ্জা, মেলা বা উৎসব করা।

৩.দ্বীনের অংশ মনে করে বিশেষ দিবস উদযাপন করা, যার কোনো শরয়ি ভিত্তি নেই।

৪.মিলাদ বা খতমকে এমনভাবে আবশ্যক বানানো যেন তা না করলে গুনাহ হবে।

কথাবার্তা ও দোয়ার ক্ষেত্রে বিদআত

১.এমন দোয়া বা বাক্যকে সুন্নাহ মনে করা, যার কোনো সহীহ ভিত্তি নেই।

২.সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট সুরে যিকির করা, যা রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে ছিল না।

৩.ইবাদতের সময় নিজের তৈরি বিশেষ বাক্যকে আবশ্যক মনে করা।

চেহারা ও আচরণে বিদআত

দ্বীনের অংশ মনে করে বিশেষ পোশাক বা চিহ্ন বাধ্যতামূলক করা, অথচ তার শরয়ি দলিল নেই।

এমন কষ্টকর পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করা, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

ইসলামে প্রতিটি আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ– ১. তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

২. তা রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে।

যে কাজ দেখতে ভালো বা আবেগপূর্ণ হলেও যদি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত না হয় এবং দ্বীনের অংশ হিসেবে পালন করা হয়, তবে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাই মুসলমানের দায়িত্ব হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন থেকে সতর্ক থাকা।

বিদ’ আতের ক্ষতিকর দিকসমূহ

বিদ’ আত শুধু একটি ভুল আমল নয়; বরং এটি ধীরে ধীরে মানুষের ঈমান, আমল ও দ্বীনের বিশুদ্ধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাহ্যিকভাবে অনেক বিদআত ভালো কাজ মনে হলেও তা মানুষকে সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

১. বিদ’ আত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না

মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–

“যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে, যার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।”

– সহীহ মুসলিম, হাদিস : ১৭১৮

অর্থাৎ মানুষ যত আন্তরিকতার সাথেই বিদআত করুক না কেন, যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত না হয় তবে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না।

২. বিদ’ আত সুন্নাহকে ধ্বংস করে

যখন কোনো সমাজে বিদ’ আত চালু হয়, তখন ধীরে ধীরে সুন্নাহ হারিয়ে যেতে থাকে। মানুষ সুন্নাহ ছেড়ে নতুন উদ্ভাবিত আমলের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে।
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন–
“কোনো জাতি যখন বিদআত চালু করে, তখন সমপরিমাণ সুন্নাহ তাদের থেকে উঠে যায়।”
অর্থাৎ বিদ’ আত যত বাড়ে, সুন্নাহ তত কমে যায়।
৩. বিদ’ আত মানুষকে গোমরাহ করে
রাসূল ﷺ বলেছেন–
“প্রত্যেক বিদ’ আতই গোমরাহী।”
– সহীহ মুসলিম, হাদিস : ৮৬৭
বিদ’ আত মানুষকে ধীরে ধীরে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দেয়। প্রথমে ছোট একটি নতুন আমল দিয়ে শুরু হলেও পরে তা বড় বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. বিদ’ আত দ্বীনের পূর্ণতাকে অস্বীকার করার শামিল

আল্লাহ তাআলা বলেছেন–
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”
– সূরা আল-মায়িদাহ : ৩
দ্বীন যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে নতুন ইবাদত সংযোজনের অর্থ হলো– দ্বীন এখনও অসম্পূর্ণ ছিল। এটি অত্যন্ত ভয়াবহ চিন্তা।

৫. বিদ’ আতকারীরা তওবার প্রয়োজন কম অনুভব করে

সাধারণ গুনাহকারী বুঝতে পারে যে সে ভুল করছে, তাই তার তওবার সুযোগ থাকে। কিন্তু বিদআতকারী মনে করে সে ভালো কাজ করছে। ফলে সে সহজে তওবা করতে চায় না।
সুফইয়ান আস-সাওরি বলেন–

“শয়তানের কাছে বিদআত গুনাহের চেয়েও বেশি প্রিয়। কারণ গুনাহ থেকে তওবা করা হয়, কিন্তু বিদআত থেকে তওবা কম করা হয়।”

৬. বিদ’ আত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে

বিদ’ আতের কারণে বিভিন্ন দল ও মতবাদ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজেদের পদ্ধতিকেই সঠিক মনে করে, ফলে ঐক্য নষ্ট হয়।
আল্লাহ বলেন–
“তোমরা বিভক্ত হয়ো না।”
– সূরা আলে ইমরান : ১০৩
সুন্নাহ মানুষকে এক করে, আর বিদআত বিভক্ত করে।

৭. বিদ’ আত শিরকের দরজা খুলে দেয়

ইতিহাসে দেখা যায়, বহু শিরক প্রথমে অতিরঞ্জন ও বিদআত থেকে শুরু হয়েছিল। নেককার ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সম্মান করতে করতে মানুষ একসময় তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া শুরু করে।
ইবনে তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেন যে, অধিকাংশ শিরকের সূচনা হয়েছিল বিদআত ও অতিরঞ্জনের মাধ্যমে।

৮. বিদ’ আত আমলের বরকত নষ্ট করে

বিদ’ আত মানুষকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখে যার কোনো সওয়াব নেই। ফলে সময়, শ্রম ও ইবাদতের শক্তি নষ্ট হয়।
অনেক সময় মানুষ ফরজ ও সুন্নাহ আমলে অলস হয় কিন্তু বিদ’ আতী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়ে।

৯. বিদ’ আত পরবর্তী প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে

একটি বিদআত সমাজে প্রচলিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম সেটাকেই দ্বীনের অংশ মনে করতে শুরু করে। তখন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়।

১০. বিদ’ আতের পরিণাম ভয়াবহ

রাসূল ﷺ বলেছেন–
"প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।"
– সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ১৫৭৮
এ কারণে সালাফে সালেহীন বিদআতকে অত্যন্ত ভয় করতেন এবং মুসলিমদের সতর্ক করতেন।

বিদ’ আত দেখতে ছোট বা ভালো মনে হলেও এর ক্ষতি অত্যন্ত গভীর। এটি ঈমান দুর্বল করে, সুন্নাহ ধ্বংস করে, মানুষকে গোমরাহির পথে নেয় এবং উম্মাহর ঐক্য নষ্ট করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং দলিল ছাড়া কোনো আমল না করা।

বিদ’ আত থেকে বেঁচে থাকার উপায়

বিদআত থেকে বাঁচা একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিদআত মানুষের আমল নষ্ট করে, সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে গোমরাহির দিকে নিয়ে যায়। তাই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিদআত থেকে বাঁচার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

বিদআত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায় হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন–
"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।"
– সূরা আলে ইমরান : ১৩২
মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–
"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তা আঁকড়ে ধরবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না– আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"
– মুয়াত্তা মালিক
যে ব্যক্তি কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী আমল করবে, সে সহজে বিদআতে জড়াবে না।

২. আমলের আগে দলিল যাচাই করা

কোনো আমল করার আগে দেখতে হবে–
এটি কি কুরআন বা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত?
রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম বা সালাফে সালেহীন কি এটি করেছেন?
যদি কোনো ইবাদতের দলিল না পাওয়া যায়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা নিরাপদ।
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন–
"অনুসরণ করো, নতুন কিছু উদ্ভাবন করো না; কারণ তোমাদের জন্য যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

৩. বিশুদ্ধ আকীদা ও দ্বীনি ইলম অর্জন করা

অজ্ঞতা বিদআতের বড় কারণ। অনেক মানুষ না জেনেই বিদআতকে ইবাদত মনে করে।
আল্লাহ বলেন–

"তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।"
– সূরা আন-নাহল : ৪৩
তাই সহীহ আকীদা, তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক ইলম অর্জন করা জরুরি।

৪. সালাফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করা

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন দ্বীন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে বুঝেছেন। তাদের পথ অনুসরণ করলে বিদআত থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
ইমাম মালিক বলেন–
"যে বিষয় সেদিন দ্বীন ছিল না, আজও তা দ্বীন হতে পারে না।"
অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে যা ইবাদত ছিল না, তা পরবর্তীতে ইবাদত হতে পারে না।

৫. বিদ' আতী পরিবেশ ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা

অনেক সময় সমাজ, পরিবার বা পরিবেশের কারণে মানুষ বিদআতে জড়িয়ে পড়ে। তাই এমন অনুষ্ঠান, রীতি বা সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে যেখানে শরিয়তবিরোধী কাজ হয়।

৬. সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ তৈরি করা

যখন মানুষ সুন্নাহকে ভালোবাসে, তখন বিদআতের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তাই দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট সুন্নাহ জীবিত করার চেষ্টা করতে হবে।
যেমন–
সালামের প্রচলন
মিসওয়াক করা
ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা
সুন্নাহ দোয়া পড়া
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকভাবে আদায় করা

৭. আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শেখা

বিশুদ্ধ আকীদা ও সুন্নাহর অনুসারী আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শেখা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভুল ব্যক্তি থেকে দ্বীন শিখলে বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন–

“এই ইলমই দ্বীন; তাই দেখে নাও কার কাছ থেকে দ্বীন শিখছ।”

৮. অতিরঞ্জন থেকে বেঁচে থাকা

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন অনেক সময় বিদআতের দিকে নিয়ে যায়।

মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–

“তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো।”

– সুনানে নাসাঈ

৯. বেশি বেশি দোয়া করা

হিদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই বিদআত ও গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া–

“হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন।”

– জামে তিরমিযী

১০. বিদ’ আতের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থাকা

যে ব্যক্তি বিদ’ আতের ভয়াবহতা জানবে, সে সহজে এতে জড়াবে না। তাই বিদআত সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও সালাফদের বক্তব্য অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

অধ্যায়-৮:ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা

মহান আল্লাহ বলেন,

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق
. من سبيله الكم وصيكم به لعلكم تتقو

নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল। খবরদার। মিথ্যা পথ অবলম্বন করো না। অন্যথায় সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতেবিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা সংযত ও সতর্ক হও।" (সূরাহ্ আন'আম : ১৫৩)

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-"নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত , তেমনিভাবে আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি জামা'আত : তাদের সকল ফিরকাই জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) প্রশ্ন করেন, সেই জামা'আত কোনটি? নবী (সাঃ) জওয়াব দিলেন- "আমি ও আমার সাহাবীগণের তরীকার উপর যারা থাকবে।" (তিরমিযী ও মিশকাত: ৩০)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আখিরী উম্মত ঈমানের দিক দিয়ে ৭৩ ফিরকা বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে শুধু একটি জামা'আত জান্নাতী হবে এবং অবশিষ্ট ৭২টি ফিরকা ঈমান ও আকীদার কারণে জাহান্নামী হবে।

একথা প্রমাণিত যে, নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী প্রতিফলিত ইয়েছে। উম্মতের মধ্যে বহু গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। এদের কোনটা সুস্পষ্ট কুফরী আকীদা অবলম্বন করার দরুণ দ্বীন ও ঈমানের গন্ডি সম্পূর্ণরূপে খারিজ হয়ে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। আর কোন কোনটা ৩. গোমরাহ ও বিদ'আতী। তারা কাফির না হলেও নিশ্চিতভাবে আহলে ওয়াল জামা'আত বা আহলে হকের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।আহলে হক ভূক্ত কোন ব্যক্তি আকীদার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে না, তবে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ আমলের ত্রুটির কারণে সাময়িকভাবে জাহান্নামী হতে পারে। আর অবশিষ্ট বাতিল ফিরকাহ্ সমূহ আকীদা ও আমল উভয় প্রকার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি যে সহীহ ঈমান ও আকীদা উম্মতের সামনে পেশ করেছিলেন এবং যে নকশার উপর সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান নামধারী অনেক লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং দ্বীনে 'ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সহীহ আকীদা সমূহকে পরিবর্তন করে তার স্থলে ভ্রান্ত আকীদার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বানী প্রণিধানযোগ্য- "শেষ যামানায় অনেক দাজ্জাল-কাজ্জাবের আবির্ভাব ঘটবে; তারা দ্বীনের নামে এমন এমন কথা প্রচার করবে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারাও কোনদিন শুননি। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ্ না করে ফেলে।" (মুসলিম শরীফ)

প্রত্যেক যুগেই অনেক মূর্খ ও বে-ইলম লোকেরা ইসলামের নামে আবিষ্কৃত সেসব নতুন নতুন ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান নষ্ট করেছে এবং আহলে হকের জামা'আত থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ফিতনা-ফাসাদ অনেক বেশী হওয়ায় এবং অধিকাংশ লোক দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় তাদের অনেকেই ইসলামের নামে সেসব বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে নিজেদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করে ফেলছে।

তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে যে পরিমাণ কিতাবপত্র রচনা ও যতটুকু আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার ছিল, তা হয়নি। অপরদিকে মধুর নামে বিষ পান করানোর ন্যায় বাতিল আকীদায় ভরপুর বই-পুস্তকে বাজার ছেয়ে গেছে। বাতিল আকীদার প্রচার ও প্রসার হচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। এহেন মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের লক্ষ্যে সহীহ আকীদা বর্ণনার পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদা সমূহের আলোচনা অতীব জরুরী।

ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকিদা

ভ্রান্ত আকীদা-১: ইসলামের নামে একটি গোমরাহ ফিরকা এরূপ ধারণা রাখে যে, আল্লাহ ও রাসূল একই সত্ত্বা বিশেষ। অর্থাৎ যিনি রাসুল, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই 'মুহাম্মদ' নাম ধারণ করে মানুষের আকৃিতিতে দুনিয়ায় অবতরণ করেছিলেন। তারা আরো বলে থাকে যে,খোদা ও আহমদ-এর মধ্যে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। খোদা মীমের যবনিকা টেনে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ছুরত ধারণ করে লোকালয়ে এসেছেন। নচেৎ উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এ কথাটি তারা কবিতার মাধ্যমেও বলে থাকে-

"মুহাম্মদ নাম ধারণ করে কে এলোরে মদীনায়, আসল কথা বলতে গেলে পড়বে দড়ি এ গলায়।"   (নাউজুবিল্লাহ)

এ ধরনের আকীদা সুস্পষ্ট কুফর। এরূপ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে যে বের হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয়। কোন সৃষ্ট জীবের সাথে কোনভাবেই তাঁর তুলনা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নবীকে সরাসরি খোদার সাথে তুলনা করা বা খোদা ও রাসুল (সাঃ)কে একই সত্ত্বা বলা যে কত বড় জঘন্য অপরাধ ও কুফরী আকীদা, তা অতি সহজেই অনুমেয়। (সূরাহ্ পূরাঃ ১১, আকীদাতুত্ ত্বাহাবী, পৃঃ ৩১)।

ভ্রান্ত আকীদা-২: অনেক মূর্খ লোক বিশ্বাস করে যে, ওলী-বুযুর্গ, পীর-সাধক, মাযার-দরবার প্রভৃতি মানুষের মনের মাকসুদ পূর্ণ করতে পারে, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি দান করতে পারে এবং বিপদ-আপদ দূর করতে পারে। এ ভ্রান্ত আকীদার বশবর্তী হয়ে তারা বিভিন্ন পীরের নামে মান্নত ও নযর-নিয়ায করে, তাদেরকে বা তাদের মাযারকে সিজদা করে, তাদের কবর তাওয়াফ করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে ইত্যাদি।

অথচ মান্নত বা নযর, সিজদা, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও প্রার্থনা এ সবই ইবাদত এবং এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং এগুলো অন্যের জন্য করা কুফরী ও শিরকী কাজ। এর থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ এবং এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাকসুদ পূর্ণ করেন, তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের সকল বিপদ আপদ দূর করতে পারেন। এ ক্ষমতা তিনি পীর-বুযুর্গ তো দূরের কথা, কোন নবী রাসূলকে পর্যন্ত দান করেন নি।

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-৩: ইয়াহুদী জাতি যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে নিজেদের দুশমন মনে করতো, তেমনিভাবে অনেক মূর্খ মুসলমানও হযরত 'আজরাঈল (আঃ)কে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখায় না। এ কারণে যে, তিনি জান কবজ করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে, ফেরেস্তাগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আমাদের অনেক উপকার করেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের নাম
শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা আমাদের রানী জরুরী। সুততার হযরত আজরাঈল (আঃ) কে খারাপ ভাবা মারাত্মক ভুল। উনার নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা আমাদের জন্য জরুরী। হযরত আজরাঈল (আঃ) কে খারাপ ভাবা মারাত্মক ভুল। কেননা, হযরত 'আজরাঈল আঃ আল্লাহর হুকুমের দাস। তিনি আল্লাহর নির্দেশে মাখলুকের জান কবজ করেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় কোন মানুষের জীবন হরণ করেন না। তাছাড়া একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের পরম উপকারী। কেননা, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে পৃথক করে খোদার সান্নিধ্যে নিয়ে পৌঁছান। সুতরাং কখনো হযরত 'আজরাঈল (আঃ)কে খারাপ ভাবা উচিত হবে না। আল্লাহর নির্দেশে তিনি জান কবজ করেন। তাই তাঁকে খারাপ ভাবা বা তার সম্পর্কে মন্দ বলা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। (সূরাহ্ বাকারাহ : ৯৮, সূরাহ্ নিসাঃ ১৩৬,আকীদাতুত ত্বহাবী:৮১)

আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-৪: শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, প্রচলিত কুরআন আসল কুরআন নয়; বরং এটি হচ্ছে পরিবর্তিত কুরআন; এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ) ও শি'আ সম্প্রদায়ের ইমামদের ব্যাপারে যেসব আয়াত ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সেসব আয়াত কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন। আর আসল কুরআন তাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে সতের হাজার আয়াত রয়েছে। উক্ত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি আসল কুরআন সাথে নিয়ে আসবেন।

এ আকীদা স্পষ্ট কুফরী আকীদা। যে উক্ত আকীদা পোষণ করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-"নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণকারী।" (সূরাহ্ হিজরঃ ৯)
করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণকারী।" (সূরাহ্ হিজরঃ ৯)

ভ্রান্ত আকীদা-৫: অনেকে মনে করে যে, ইঞ্জীল শরীফ (খৃষ্টানদের ভাষায় বাইবেল) সহীহ আসমানী কিতাব এবং তা এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও অবিকল অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করতে বা মানতে কোন অসুবিধা নেই।

এ ধরনের আকীদা কুফরী। কারণ, কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, "পূর্বের সকল আসমানী কিতাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।" (সূরাহ বাকারা, '৭৯)। বরং বাইবেলেই এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো বাইবেল বিকৃত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত "বাইবেল ছে কুরআন তক' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-৬: কাদিয়ানী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবী করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নন। বরং তারপরেও আরো নবী আসতে পারেন। এর কিছু দিন পর সে নিজেই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। আর অনেক মূর্খ লোক তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করা বা এরূপ দাবী সমর্থন করা প্রকাশ্য কুফর। নবুওয়াত দাবী করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজে কাফির হয়েছে এবং এ দাবী মেনে নেয়ার কারণে তার অনুসারীরাও কাফির হয়েছে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। মুফতী আযম শফী (রাহঃ) তৎপ্রনীত 'খতমে নবুওয়াত' নামক কিতাবে প্রায় একশ'টি আয়াতে কুরআনী পেশ করেছেন (সূরাহ আহযাবঃ ৪০, সুরাহ বাকারাহ: ৪ ইত্যদি) যেগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবীই শেষ নবী এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের ও ওহীর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এজন্য নবী (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর যখন 'মুসাইলামাতুল কাযযাব' নবুওয়াত দাবী করে, তখন এই মর্মে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের নবীই শেষ নবী। তাঁর পরে কোনক্রমেই আর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটতে পারে না। সুতরাং যে কেউ এখন নবুওয়াতের দাবী করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাকে কতল করে দেয়া জরুরী। উল্লেখিত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ঐক্যমতের ভিত্তিতে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কতল করে উম্মতের ঈমান হিফাজতের ব্যবস্থা করেন।

বিশুদ্ধ ঈমান ও সহীহ আকিদা পরীক্ষা

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মুসলমানের ঈমানের মূল ভিত্তি। আকিদা সঠিক হলে মানুষের বিশ্বাস, ইবাদত, চরিত্র ও জীবন পরিচালনা সঠিক পথে পরিচালিত হয়। একজন মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল ও আনুগত্য সৃষ্টি হয় বিশুদ্ধ আকিদার মাধ্যমে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে নিয়মিত যাচাই করা এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে আত্মসমালোচনা করা। নিচের প্রশ্নগুলো একজন মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করতে, নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে এবং বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনের গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করবে।

১. আমার আকিদা কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, নাকি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির উপর?

২. আমি কি একমাত্র আল্লাহকেই সকল ক্ষমতার মালিক ও সাহায্যকারী হিসেবে বিশ্বাস করি?

৩. কোনো বিপদে পড়লে আমি প্রথমে আল্লাহর উপর ভরসা করি, নাকি অন্য কারো উপর অতিরিক্ত নির্ভর করি?

৪. আমি কি শিরক, কুসংস্কার ও বিদআত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি?

৫. আমার ঈমান কি শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ, নাকি আমার আমল ও চরিত্রেও তার প্রভাব দেখা যায়?

৬. আমি কি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখি?

৭. রাসূল-এর সুন্নাহ অণ করার ব্যাপারে আমি কতটা সচেতন?
৭. রাসূল-এর সুন্নাহ অনুসরণ করার ব্যাপারে আমি কতটা সচেতন?

৮. আমি কি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি এমন বিশ্বাস রাখি যা আমার জীবন পরিচালনায় প্রভাব ফেলে?

৯. আমার দৈনন্দিন জীবনে তাওহীদের শিক্ষা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে?

১০. আমি কি অন্যের প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইবাদত করি নাকি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য?

১১. আমার অন্তরে কি আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সমানভাবে কাজ করে?

১২. আমি কি ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করছি?

১৩. কোনো কষ্ট বা পরীক্ষার সময় আমি কি আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি?

১৪. আমি কি আমার সন্তান ও পরিবারকে বিশুদ্ধ আকিদার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি?

১৫. বিশুদ্ধ আকিদা আমার নৈতিকতা, আচরণ ও সমাজজীবনে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে?

১৬. আমি কি গুনাহ করার পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসি?

১৭. আমার অন্তরে কি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের অনুভূতি আছে?

১৮. আমি কি ইসলামের নামে প্রচলিত ভুল বিশ্বাস যাচা করার চেষ্টা করি?

১৯. আমি কি কুরআন ও হাদীস বুঝে পড়ার আগ্রহ রাখি যাতে আকিদা বিশুদ্ধ থাকে?

২০. আমি কি মনে করি যে রিজিক, জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে?

২১. আমি কি ভাগ্য (তাকদীর) এর প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখি এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকি?

২২. আমার ঈমান কি শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি ব্যবসা, পরিবার ও সমাজজীবনেও প্রকাশ পায়?

২৩. আমি কি মানুষের ভয় অপেক্ষা আল্লাহর ভয়কে বেশি গুরুত্ব দিই?

২৪. আমি কি কোনো ব্যতি বা বস্তু সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখি যা আল্লাহর এবাদের পরিপন্থী?

২৫. আমি কি প্রতিদিন নিজের ঈমান ও আকিদা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি?

২৬. আমার কথাবার্তা ও আচরণ কি একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বহন করে?

২৭. আমি কি দুনিয়ার লাভের চেয়ে আখিরাতের সফলতাকে বেশি গুরুত্ব দিই?

২৮. আমি কি আল্লাহর রহমতের প্রতি আশাবাদী এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করি?

২৯. আমি কি ইসলামের আকিদা সম্পর্কে অন্যকে সঠিকভাবে জানাতে আগ্রহী?

৩০. আমি কি এমন কোনো কাজ করি যা ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে?

অধ্যায়-৯:শেষকথা

একজন মুসলমানের জীবন গঠন, চরিত্র নির্মাণ এবং ঈমানকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা অপরিসীম। আকিদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যত শক্তিশালী হবে, একজন মানুষের ঈমান, আমল ও নৈতিকতা তত সুন্দর ও মজবুত হবে। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে শিক্ষা দেয় এবং শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে রাখে। এর মাধ্যমে একজন মুসলমান বুঝতে পারে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী এবং কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

এছাড়াও বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাকে অন্যায়, পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। একজন মুসলমান যখন বিশুদ্ধ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ইবাদত শুদ্ধ হয়, আমল গ্রহণযোগ্য হয় এবং সমাজেও শান্তি, সৌহার্দ্য ও নৈতিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা করা, তা অন্তরে ধারণ করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা বিশুদ্ধ আকিদাই একজন মুমিনের ঈমান রক্ষা ও জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

ঈমান আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার এক স্থায়ী অঙ্গিকারের নাম; যার কোনো মেয়াদ নেই। যখনই ঈমানের সম্পদ পাওয়া গেল তখন থেকেই এর পুষ্টি ও বর্ধন, শক্তি ও সংস্কারে মগ্ন থাকা জরুরি। সবসময় সতর্ক থাকা চাই, এমন কোনো কথা বা কাজ যেন প্রকাশিত না হয়, যা ঈমান নষ্ট করে। আর আল্লাহর দরবারে তাঁর শেখানো দুআ করতে থাকা চাই-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও,

নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। -সূরা আলে ইমরান ৩:৮

আল্লাহর কাছে ঐ বান্দার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমানের উপর অবিচল থাকে।

পক্ষান্তরে যে ঈমান থেকে সরে যায় সে তো দুই বিদ্রোহে লিপ্ত-কুফরের বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের বিদ্রোহ।

অবিচল মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে খোশখবরি-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَبُ

الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

* যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ' অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

* তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করত তার পুরস্কার স্বরূপ। -আল আহকাফ ৪৬ ১৩-১৪

অন্য আয়াতে আছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَولِياكُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ

فِيهَا مَا تَشْتَهِنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়, ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর।

* এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। -সূরা হামীম আসসাজদা ৪১: ৩০-৩২

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের উপর কায়েম থাকে না; বরং পশ্চাদপসরণ করে কিংবা বারবার এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করে এদের কাছে দ্বীন এক ক্রীড়ার বস্তু।